ইসলামী পুনর্জাগরণ
পথ ও পদ্ধতি

মূল
শায়খ মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন

অনুবাদ
নূরুল ইসলাম

ইসলামী পুনর্জাগরণ
পথ ও পদ্ধতি

মূল : শায়খ মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন

অনুবাদ : নূরুল ইসলাম
বি.এ. অনার্স (ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট, ফ্যাকাল্টি ফার্স্ট)
এম.এ.(ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট)

শ্যামলবাংলা একাডেমী, রাজশাহী

ইসলামী পুনর্জাগরণ : পথ ও পদ্ধতি
নূরুল ইসলাম

প্রকাশনায় :
শ্যামলবাংলা একাডেমী
নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী।
এসবিএ প্রকাশনী-৩

প্রকাশকাল :
ফেব্রুয়ারী ২০১১
মাঘ ১৪১৭
ছফর ১৪৩২

কম্পোজ :
মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম
ও আতীকুল ইসলাম

প্রচ্ছদ :
আল-মারূফ
সুপারকম রিলেশন
গোরহাঙ্গা, রাজশাহী।

মুদ্রণ :
বৈশাখী প্রেস
গোরহাঙ্গা, রাজশাহী।

মূল্য : ৫০ (পঞ্চাশ) টাকা মাত্র।

ISLAMI PUNARJAGARAN : PATH O PADDHATI (Islamic Awakening : Ways and Methods) Written by **Sheikh Muhammad bin Saleh Al-Othaymeen** and Translated by **Nurul Islam**. 1st edition : February 2011. Published by Shamolbangla Academy, Rajshahi. Price : Tk. 50 (Fifty) & US $ 2 (Two) Only.

ISBN : 978-984-33-2357-6

সূচিপত্র

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

অনুবাদকের নিবেদন

ইসলামই আল্লাহ্র নিকট একমাত্র মনোনীত দ্বীন *(আলে ইমরান ১৯)* এবং একটি পূর্ণাঙ্গ কালজয়ী জীবনাদর্শ। ১৯২৬ সালে ইহুদী থেকে মুসলমান হওয়া বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ মুহাম্মাদ আসাদ বলেছেন, Islam appears to me like a perfect work of architecture. All its parts are harmoniously conceived to complement and support each other; nothing is superfluous and nothing lacking, with the result of an absolute balance and solid composure. 'আমার মনে হয়েছে ইসলাম এক পরিপূর্ণ স্থাপত্য শিল্পের মতো। এর এক অংশ অন্য অংশের সাথে পারস্পরিক সহযোগিতার সূত্রে এমন সুদৃঢ়ভাবে সুবিন্যস্ত যে, এর কোন একটি প্রয়োজনাতিরিক্ত নয় এবং কোন একটিরও নেই স্বল্পতা। ফলে তা হয়েছে সুসমন্বিত এবং সুগঠিত এক কাঠামো'।

বিশ্বমানবতাকে ধ্বংসের অতল গহ্বর থেকে টেনে তুলে ছিরাতে মুস্তাকীমে পরিচালিত করার লক্ষ্যে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মহানবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে এ বসুধায় প্রেরণ করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন, 'তিনিই তাঁর রাসূলকে প্রেরণ করেছেন হেদায়াত ও সত্য দ্বীনসহ সকল দ্বীনের উপর একে বিজয়ী করার জন্য, যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে' *(তওবা ৩৩; ছফ ৯)*। এ আয়াত ইসলামের বিশ্বব্যাপী প্রসার লাভ এবং তার সামগ্রিক বিজয়ের ইঙ্গিত বহন করে। অনেকে মনে করেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ), খোলাফায়ে রাশেদীন এবং ন্যায়পরায়ণ শাসকদের শাসনামলে আল্লাহ্র এ ওয়াদা পরিপূর্ণরূপে বাস্তবায়িত হয়েছে। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার তা নয়। বরং উল্লিখিত সময়ে ঐ সত্য ওয়াদার কিয়দংশ মাত্র বাস্তবায়িত হয়েছে।[১] এ মর্মে আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'লাত ও উয্যা মূর্তিদ্বয়ের পূজা না করা পর্যন্ত দিন ও রাত শেষ হবে না'। আয়েশা (রাঃ) বলেন, তখন আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার ধারণা ছিল, যখন আল্লাহ তা'আলা 'তিনিই তাঁর রাসূলকে প্রেরণ করেছেন হেদায়াত ও সত্য দ্বীনসহ সকল দ্বীনের উপর একে বিজয়ী করার জন্য, যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ

১. মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী, সিলসিলাতুল আহাদীছ আছ-ছহীহা (বৈরূত : আল-মাকতাবুল ইসলামী, ৪র্থ প্রকাশ, ১৪০৫ হিঃ/১৯৮৫ খৃঃ), ১ম খণ্ড, পৃঃ ৬।

করে' *(তওবা ৩৩; ছফ ৯)* আয়াতটি অবতীর্ণ করেন, তখন মূর্তিপূজার দিন শেষ হয়ে গেছে (অর্থাৎ আপনার আগমনের ফলে ইসলামের বিজয় পূর্ণতা লাভ করেছে)। উত্তরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, إِنَّهُ سَيَكُوْنُ مِنْ ذَلِكَ مَا شَاءَ اللهُ 'ভবিষ্যতে এটা বাস্তবায়িত হবে যতটুকু আল্লাহ ইচ্ছা করবেন'।[২]

এ সম্পর্কে আরো অনেক হাদীছ বর্ণিত হয়েছে, যেগুলো দ্বারা বিশ্বব্যাপী ইসলামের কর্তৃত্ব ও প্রচার-প্রসারের পরিধি অবগত হওয়া যায়। যেমন- রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ اللهَ زَوَى لِيَ الْأَرْضَ، فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا، وَإِنَّ أُمَّتِيْ سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا. 'আল্লাহ তা'আলা ভূপৃষ্ঠকে আমার জন্য সংকুচিত করলেন, তখন আমি তার পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত দেখলাম। অদূর ভবিষ্যতে আমার উম্মতের রাজত্ব সেই পর্যন্ত পৌঁছে যাবে, যে পর্যন্ত যমীন আমার জন্য সংকুচিত করা হয়েছিল'।[৩]

মিকদাদ বিন আসওয়াদ (রাঃ) বলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছেন যে, 'ভূপৃষ্ঠে এমন কোন মাটির ঘর বা তাঁবু থাকবে না, যেখানে আল্লাহ ইসলামের বাণী পৌঁছে দিবেন না- সম্মানীর ঘরে সম্মানের সাথে এবং অসম্মানীর ঘরে অসম্মানের সাথে। অতঃপর আল্লাহ যাদেরকে সম্মানিত করবেন, তাদেরকে স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণের যোগ্য করে দিবেন। আর যাদেরকে তিনি অসম্মানিত করবেন, তারা (জিযিয়া দানে) ইসলামের বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য হবে'। আমি বললাম, তাহলে তো দ্বীন পূর্ণরূপে আল্লাহ্র জন্য হয়ে যাবে। (অর্থাৎ সকল দ্বীনের উপরে ইসলাম বিজয় লাভ করবে)।[৪]

আবূ কাবীল থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আছ (রাঃ)-এর নিকট ছিলাম। তাকে জিজ্ঞেস করা হল, কনস্টান্টিনোপল ও রোম- এ দু'টি নগরীর মধ্যে প্রথমে কোনটি বিজিত হবে। তখন আব্দুল্লাহ একটি আংটাওয়ালা বাক্স নিয়ে আসতে বললেন। বর্ণনাকারী বলেন, সেই বাক্স থেকে একটি বই বের করে

২. মুসলিম, হাদীছ নং-২৯০৭, 'ফিতনা ও কিয়ামতের আলামত' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১৭; মিশকাত, হাদীছ নং-৫৫১৯, 'ফিতনা' অধ্যায়, 'খারাপ লোকদের উপর কিয়ামত সংঘটিত হবে' অনুচ্ছেদ।

৩. মুসলিম, হাদীছ নং-২৮৮৯, 'ফিতনা ও কিয়ামতের আলামত' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৫; মিশকাত, হাদীছ নং-৫৭৫০, 'ফাযায়েল ও শামায়েল' অধ্যায়, 'নবীকুল শিরোমণি-এর মর্যাদা সমূহ' অনুচ্ছেদ।

৪. আহমাদ, হাদীছ নং-১৬৩৪৪; মিশকাত, হাদীছ নং-৪২, 'ঈমান' অধ্যায়, সনদ ছহীহ।

আব্দুল্লাহ বললেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পাশে বসে হাদীছ লিপিবদ্ধ করছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, কনস্টান্টিনোপল ও রোম- এ দু'টি নগরীর মধ্যে প্রথমে কোনটি বিজিত হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেছিলেন, হিরাক্লিয়াসের নগরী তথা কনস্টান্টিনোপল প্রথমে বিজিত হবে'।[৫]

উল্লেখ্য, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী করার ৮০০ বছরের অধিক সময় পর ২০শে জুমাদাল উলা রোজ মঙ্গলবার ৮৫৭ হিজরী মোতাবেক ২৯শে মে ১৪৫৩ খৃষ্টাব্দে উছমানীয় খলীফা, দিগ্বিজয়ী বীর মুহাম্মাদ আল-ফাতিহ (শাসনকাল : ৮৫৫-৮৮৬ হিঃ/১৪৫১-১৪৮১ খৃঃ) কনস্টান্টিনোপল (Constantinople) বিজয় করেন।[৬]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমাদের মধ্যে (১) নবুঅত থাকবে যতদিন আল্লাহ ইচ্ছা করবেন, অতঃপর তা উঠিয়ে নিবেন (২) এরপরে নবুঅতের তরীকায় খেলাফত কায়েম হবে। যতদিন ইচ্ছা আল্লাহ সেটা রেখে দিবেন, অতঃপর উঠিয়ে নিবেন। (৩) অতঃপর অত্যাচারী রাজাদের আগমন ঘটবে। আল্লাহ যতদিন ইচ্ছা তাদেরকে বহাল রাখবেন। অতঃপর উঠিয়ে নিবেন। (৪) এরপর জবর দখলকারী শাসকদের আমল শুরু হবে। আল্লাহ যতদিন ইচ্ছা তাদেরকে বহাল রাখবেন। অতঃপর উঠিয়ে নেবেন। (৫) এরপরে নবুঅতের তরীকায় পুনরায় খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে। এ পর্যন্ত বলার পরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) চুপ হয়ে গেলেন'।[৭]

বর্তমানে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিভিন্নভাবে মিথ্যা প্রচার-প্রপাগাণ্ডা চালানো হচ্ছে। এতদসত্ত্বেও বিশ্বব্যাপী অমুসলিমদের মধ্যে ইসলামকে জানার ব্যাপক আগ্রহ পরিলক্ষিত হচ্ছে। এশিয়া, ইউরোপ, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া সর্বত্রই ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণকারীর সংখ্যা বাড়ছে। খোদ ব্রিটেনে প্রতি বছর ৫ হাজার মানুষ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করছে। গত এক দশক আগে সেখানে

৫. আহমাদ, হাদীছ নং-৬৩৫৮; সিলসিলা ছহীহা ১/৭-৮, হাদীছ নং-৪, হাকেম হাদীছটিকে ছহীহ বলেছেন এবং যাহাবী তাকে সমর্থন করেছেন।

৬. ড. আলী মুহাম্মাদ আছ-ছাল্লাবী, আদ-দাওলাতুল উছমানিয়্যাহ (মিসর : মুওয়াস্সাসাতু ইকরা, ১ম প্রকাশ, ১৪২৬ হিঃ/২০০৫ খৃঃ), পৃঃ ১০০; S.M.Imamuddin, A Modern History of the Middle East and North Africa (Dacca : Najmahsons, 2nd edition, 1970), Vol.1, p.112.

৭. আহমাদ, হাদীছ নং-১৭৬৮০; সিলসিলা ছহীহা ১/৮, হাদীছ নং-৫, হাদীছটি ছহীহ।

ইসলাম গ্রহণকারীদের সংখ্যা ১৪/২৫ হাজারের মতো থাকলেও বর্তমানে এর সংখ্যা ১ লাখের উপরে।[৮]

এভাবে বিশ্বব্যাপী ইসলামী পুনর্জাগরণ পরিলক্ষিত হচ্ছে। কিন্তু সেই জাগরণকে গলা টিপে হত্যা করার গভীর ষড়যন্ত্র চলছে। মহান আল্লাহ বলেন, 'তারা মুখের ফুঁৎকারে আল্লাহ্‌র নূর নিভিয়ে দিতে চায়, কিন্তু আল্লাহ তাঁর নূর পূর্ণরূপে উদ্ভাসিত করবেন, যদিও কাফেররা তা অপছন্দ করে' *(ছফ ৮)*। এহেন পরিস্থিতিতে বিশ্বব্যাপী মুসলিম যুবক-বৃদ্ধ, নারী-পুরুষের মাঝে পুনর্জাগরণের যে হাওয়া লেগেছে তাকে সঠিক পথে পরিচালিত করার জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত দিকনির্দেশনা। যাতে তা কুরআন মাজীদ ও ছহীহ হাদীছের নির্দেশিত 'সোজা পথ' থেকে কখনো বিচ্যুত না হয়। এ লক্ষ্যেই সঊদী আরবের বিশিষ্ট আলেম, মুফতী ও ফকীহ শায়খ মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন (১৯২৭-২০০১) রচনা করেন 'আছ-ছাহওয়া আল-ইসলামিইয়াহ যাওয়াবিত ওয়া তাওজীহাত'(الصحوة الإسلامية ضوابط وتوجيهات) শীর্ষক অত্যন্ত মূল্যবান গ্রন্থটি। এটি ১৪১৪ হিজরীতে প্রথম প্রকাশিত হয়। এরপর থেকে এর একাধিক সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। সর্বশেষ ১৪২৪ হিজরীতে শায়খ উছায়মীন ফাউন্ডেশনের তত্ত্বাবধানে রিয়াদের 'দারুল ওয়াতান' প্রকাশনী থেকে এটি প্রকাশিত হয়।

এ গ্রন্থকে তিনি দু'টি অংশে বিভক্ত করে প্রথম অংশে 'যাওয়াবিতুন মুহিম্মাতুন লিনাজাহিছ ছাহওয়া আল-ইসলামিইয়াহ' (ضوابط مهمة لنجاح الصحوة الإسلامية) শিরোনামে ইসলামী পুনর্জাগরণ সফলতা লাভের আবশ্যিক ১৪টি মূলনীতি কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে আলোচনা করেছেন। আর দ্বিতীয় অংশে রয়েছে ইসলামী পুনর্জাগরণ সম্পর্কিত ৯৯টি প্রশ্নোত্তর।

বিশ্বব্যাপী মুসলিম যুবকদের মধ্যে পুনর্জাগরণের যে হাওয়া লেগেছে তাকে শায়খ উছায়মীন (রহঃ) এ গ্রন্থে ইতিবাচক বলে অভিহিত করেছেন। তবে ইসলামী পুনর্জাগরণের ভিত্তি যেন কুরআন মাজীদ এবং ছহীহ হাদীছ হয় সেদিকে সকলের বিশেষ করে যুবকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। কারণ ইসলামী পুনর্জাগরণ এ দু'টি মৌলিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত না হলে মুসলিম উম্মাহ্‌র মধ্যে এর কার্যকর প্রভাব

৮. The Islamification of Britain : record numbers embrace Muslim Faith, The Independent, UK, 4 January 2011; 'ব্রিটেনে ইসলাম গ্রহণের হার দ্বিগুণ হয়েছে', আমার দেশ, ঢাকা, ৬ জানুয়ারী ২০১১, পৃঃ ৫।

পড়বে না এবং লাভের চেয়ে ক্ষতির পাল্লায় ভারী হবে বলে তিনি **প্রথম মূলনীতিতে** দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেছেন। পাশাপাশি কুরআন-সুন্নাহ্র পথে ফিরে যাওয়ার পদ্ধতিও বর্ণনা করেছেন।

দ্বিতীয় মূলনীতিতে তিনি জ্ঞান ও দূরদৃষ্টির প্রতি আলোকপাত করেছেন। এখানে তিনি জ্ঞানকে 'দাওয়াতের ভিত্তি ও উপাদান' (أساس الدعوة و مادتها) হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। ইসলামী পুনর্জাগরণ সফলতা লাভের জন্য শুধু আবেগই যথেষ্ট নয়; বরং ইসলামী শরী'আত সম্পর্কে জ্ঞান লাভ যে যরূরী সেদিকেও তিনি যুবকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। কেননা যে না জেনে দাওয়াত দেয় সে সংস্কারের চেয়ে ক্ষতিই করে বেশি। আহূত বিষয়, যাকে দাওয়াত প্রদান করা হবে তার অবস্থা-যোগ্যতা এবং দাওয়াত দেয়ার পদ্ধতি সম্পর্কে দাঈর পূর্ণ অবগতি থাকা আবশ্যক বলে তিনি এখানে উল্লেখ করেছেন। **তৃতীয় মূলনীতিতে** দ্বীনের সঠিক বুঝ যে আল্লাহ্র অপার মহিমা সে বিষয়ে উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়েছেন। **চতুর্থ মূলনীতিতে** দাওয়াত দানের ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা অবলম্বন, দ্রুত দাওয়াতের ফল লাভের প্রত্যাশা না করা, হিকমত বা প্রজ্ঞার গুরুত্ব ও এর কতিপয় দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছেন। **পঞ্চম মূলনীতিতে** পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধ ও ঐক্য এবং **ষষ্ঠ মূলনীতিতে** দাওয়াতের কণ্টকাকীর্ণ পথে যাবতীয় কষ্ট, ক্লেশ স্বীকার ও ধৈর্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি যুবকদের যুক্তি দিয়ে বলেছেন, একটি সুরম্য অট্টালিকা ১০টি ট্রাক্টর দিয়ে একদিনে ভেঙ্গে ফেলা সম্ভব। কিন্তু তা নির্মাণ করতে হয়ত তিন বছর বা তার বেশি সময় লেগে যেতে পারে। তেমনি সত্যিকার মুসলিম উম্মাহ গঠনে দীর্ঘ সময় লাগবে। কাজেই ধৈর্যের সাথে পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হবে।

সপ্তম মূলনীতিতে দাঈকে চরিত্রবান হওয়া ও আমল করা, **অষ্টম ও নবম মূলনীতিতে** দাওয়াতের দ্বার সবার জন্য উন্মুক্ত রাখা ও নম্র-ভদ্র আচরণ করা, **দশম মূলনীতিতে** মতভেদপূর্ণ মাসআলায় যুবকদের উদার দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ এবং এক্ষেত্রে কোন আলেমের ত্রুটি-বিচ্যুতি সংঘটিত হলে তার ভুল ধরিয়ে দেয়া এবং **একাদশ মূলনীতিতে** যুবকদেরকে আবেগ নিয়ন্ত্রণ করার আহ্বান জানিয়েছেন। কারণ শুধু আবেগ দ্বারা মুসলিম উম্মাহকে তাদের দীর্ঘ নিদ্রা ও অসচেতনতা থেকে জাগিয়ে তোলা যাবে না। বরং মাত্রাতিরিক্ত আবেগ অনেক সময় সহিংসতা ও সন্ত্রাসের পথে ধাবিত করে। **দ্বাদশ মূলনীতিতে** যুবকদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ বৃদ্ধির জন্য শিক্ষা সফর ও ভ্রমণের ব্যবস্থা করা এবং **ত্রয়োদশ মূলনীতিতে** সমাজে পাপাচারের আধিক্য দেখে

নিরাশ না হয়ে সর্বদা আশায় বুক বেঁধে দাওয়াতী মিশন অব্যাহত রাখার প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন। কারণ এক্ষেত্রে নিরাশার চাদর মুড়ি দিলে ব্যর্থতা আমাদেরকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরবে এবং দাওয়াতী কাজ স্থবির হয়ে পড়বে। সবশেষে **চতুর্দশ মূলনীতিতে** দাঈদের সাথে রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের যোগাযোগ ও রাষ্ট্রকে দাওয়াতী কাজে সহযোগিতা করার প্রতি গুরুত্ব প্রদান করেছেন।

গ্রন্থকার সংকলিত ৯৯টি প্রশ্নোত্তরের মধ্যে আমরা যে ১৫টি প্রশ্নোত্তর অনুবাদ করেছি সেগুলোতে লেখক দাওয়াতের হুকুম, দাঈর কর্তব্য, আল্লাহ্র পথে দাওয়াতের পদ্ধতি ও এক্ষেত্রে আধুনিক মিডিয়ার ব্যবহার, দাঈদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক, অন্যায় কাজ প্রতিরোধের পদ্ধতি, শারঈ জ্ঞান অর্জনের প্রকৃতি ও পদ্ধতি, বিদ'আত পরিহার, ইসলামের দাওয়াত প্রচার-প্রসারে নারীদের ভূমিকা, বিধর্মীদের দাওয়াত দেয়ার পদ্ধতি প্রভৃতি বিষয়ে আলোকপাত করেছেন।

ইসলামী পুনর্জাগরণের উপর কতিপয় গ্রন্থ রচিত হলেও অত্র গ্রন্থটির স্বাদ ও আলোচনার ধরন ভিন্ন প্রকৃতির। সে কারণে ২০০৩ সালের শেষের দিকে গ্রন্থটি আমাদের হস্তগত হওয়ার পর থেকেই বাংলাভাষী পাঠকদের জন্য তা অনুবাদের স্বপ্ন মনে জাগে। চার বছর পর মাসিক **আত-তাহরীক** আগস্ট, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০৭ এবং মার্চ ২০০৮ মোট পাঁচ সংখ্যায় এর ১৪টি মূলনীতির অনুবাদ প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত হয়। বিষয়বস্তুর গুরুত্ব বিবেচনা করত অনেকেই এটিকে গ্রন্থাকারে প্রকাশের অনুরোধ করেন। নানা ব্যস্ততায় এতদিন তা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। এক্ষণে আমরা তা বই আকারে প্রকাশ করতে পেরে মহান আল্লাহ্র শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। ইসলামী পুনর্জাগরণ প্রত্যাশী ইসলামী আন্দোলনের নেতা-কর্মীসহ আপামর মুসলিম জনসাধারণ এ গ্রন্থ পাঠে সঠিক দিকনির্দেশনা লাভ করলে আমাদের শ্রম স্বার্থক হবে।

আল্লাহ এ গ্রন্থের লেখক শায়খ উছায়মীন (রহঃ)-কে জান্নাতুল ফেরদৌসে ঠাঁই দিন এবং অনুবাদকের পরকালীন মুক্তির অছীলা হিসেবে একে কবুল করুন! আমীন!!

লেখক পরিচিতি

সঊদী আরবের খ্যাতিমান আলেম, ফকীহ, মুফতী ও সঊদী সর্বোচ্চ ওলামা পরিষদ সদস্য শায়খ উছায়মীন (রহঃ) আধুনিক মুসলিম বিশ্বের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। Wikipedia-তে তাঁর সম্পর্কে বলা হয়েছে, Uthaymeen is regarded as one of the greatest scholars during the later part of the twentieth century, along with Muhammad Nasir ad-Deen al-albani and Abdul Azeez ibn Abdullah ibn baaz. 'মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী ও আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায-এর সাথে উছায়মীনকেও বিংশ শতকের শেষার্ধের শীর্ষস্থানীয় বিদ্বান হিসেবে গণ্য করা হয়ে থাকে'।

আজীবন দরস-তাদরীস ও দাওয়াতী কাজে নিবিষ্টচিত্ত এই খ্যাতিমান ব্যক্তিত্ব ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহ্‌র খেদমতের স্বীকৃতি স্বরূপ ১৪১৪ হিজরী/ ৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯৯৪ খৃষ্টাব্দে বাদশাহ ফায়ছাল আন্তর্জাতিক পুরস্কারে ভূষিত হন।

জন্ম : মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন ১৩৪৭ হিজরীর ২৭শে রামাযান মোতাবেক ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে আধুনিক সঊদী আরবের 'আল-কাছীম' (القصيم) প্রদেশের 'উনায়যা' (عنيزة) নগরীতে এক ধার্মিক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর চতুর্থ ঊর্ধ্বতন পুরুষ উছমান 'উছায়মীন' রূপে পরিচিত ছিলেন। পরবর্তীতে এ শব্দটি উছায়মীনের নামের সাথে যুক্ত হয় এবং তিনি মুসলিম বিশ্বে 'শায়খ উছায়মীন' রূপেই সমধিক পরিচিত হন।[৯]

শৈশব ও শিক্ষা-দীক্ষা : নানা আব্দুর রহমান বিন সুলায়মান আলে দামিগ (রহঃ)-এর কাছে কুরআন মাজীদ পাঠের মাধ্যমে তিনি ইলমে দ্বীনের সবুজ শালবনে পদার্পণ করেন। ১৪ বছর বয়সে মাত্র ছয় মাসে তিনি সম্পূর্ণ কুরআন মাজীদ মুখস্থ করেন। এ সময়ের মধ্যে তিনি হাতের লেখা, অংক ও আরবী সাহিত্যের প্রাথমিক জ্ঞান লাভ করেন। শায়খ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল আযীয আল-মুতাওয়া (রহঃ)-এর কাছে তাওহীদ, ফিকহ ও আরবী ব্যাকরণ শিক্ষা অর্জনের পর তিনি উনায়যার খ্যাতিমান আলেম, মুফাসসির শায়খ আব্দুর রহমান বিন নাছির আস-সা'দীর (মৃঃ ১৩৭৬ হিঃ) দরসে বসেন। সুদীর্ঘ ১৬ বছর যাবৎ তিনি তাঁর কাছে তাফসীর, হাদীছ, সীরাত, তাওহীদ, ফিকহ, উছূলে ফিকহ, ফারায়েয, নাহু প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞানার্জন করেন। তাছাড়া শায়খ আব্দুর রহমান বিন আলী বিন আওদান (রহঃ)-এর নিকট ফারায়েয

৯. ওয়ালীদ বিন আহমাদ হুসাইন, আল-জামি লিহায়াতিল আল্লামা মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন (মদীনা মুনাওয়ারা : ১৪২২হিঃ/২০০২খৃঃ), পৃঃ ১০; www.wikipedia.org।

ও ফিকহ এবং শায়খ আব্দুর রাযযাক আফীফীর নিকট নাহু ও বালাগাত (অলংকার শাস্ত্র) অধ্যয়ন করেন।[১০]

উচ্চশিক্ষার্থে রিয়াদ গমন : এরপর উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য ১৩৭২ হিজরীতে তিনি রিয়াদের 'আল-মা'হাদুল ইলমী'তে ভর্তি হন। এখানে তিনি তাফসীর 'আযওয়াউল বায়ান'-এর লেখক শায়খ মুহাম্মাদ আল-আমীন আশ-শানকীতী (মৃঃ ১৩৯৩ হিঃ), শায়খ আব্দুল আযীয বিন নাছির বিন রশীদ, আব্দুর রহমান আফ্রিকী (মৃঃ ১৩৭৭ হিঃ) প্রমুখের কাছে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করেন। এ সময় তিনি সঊদী আরবের সাবেক গ্র্যান্ড মুফতী, বিশ্ববরেণ্য আলেমে দ্বীন শায়খ আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায (১৩৩০-১৪২০ হিঃ/১৪মে ১৯৯৯ খৃঃ)-এর কাছে ছহীহ বুখারী, ফিকহ ও ইমাম ইবনু তায়মিয়া (রহঃ)-এর কিছু গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। শায়খ উছায়মীনের জীবনে শায়খ আব্দুর রহমান বিন নাছির আস-সা'দী ও শায়খ বিন বায-এর প্রভাব ছিল অপরিসীম।[১১] পাশাপাশি তিনি রিয়াদের ইমাম মুহাম্মাদ বিন সঊদ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের শরী'আহ ফ্যাকাল্টি থেকে ১৩৭৭ হিজরীতে উচ্চতর ডিগ্রী অর্জন করেন।

কর্মজীবন : ছাত্র জীবনেই তিনি ১৩৭০ হিজরীতে উনায়যার 'আল-জামিউল কাবীর'-এ শিক্ষকতার মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন। রিয়াদের 'আল-মা'হাদুল ইলমী' থেকে ফারেগ হওয়ার পর তিনি ১৩৭৪ হিজরীতে উনায়যার 'আল-মা'হাদুল ইলমী'তে শিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত হন। ১৩৯৮-৯৯ হিজরী শিক্ষাবর্ষ থেকে আমৃত্যু তিনি ইমাম মুহাম্মাদ বিন সঊদ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের 'আল-কাছীম' শাখার শরী'আহ ফ্যাকাল্টিতে পাঠদান করেন। তাছাড়া তিনি উনায়যার 'আল-জামি আল-কাবীর' (গ্র্যান্ড মসজিদ)-এ প্রত্যেক দিন দরস প্রদান করতেন।

দাওয়াতী কর্মতৎপরতা : পাঠদান ছিল শায়খের দাওয়াতী কর্মতৎপরতার কেন্দ্রবিন্দু। হজ্জের মওসুমে বিভিন্ন তাঁবুতে হাজীদের উদ্দেশ্যে দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান, সঊদী আরবের বিভিন্ন শহরে দাওয়াতী সফর, গ্রন্থ প্রকাশ, টেলিফোনের মাধ্যমে ইউরোপ-আমেরিকা সহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বক্তব্য পেশ, রামাযান মাস ও গ্রীষ্মকালীন ছুটির সময় মসজিদে নববী ও মসজিদে হারামে দরস প্রদান, বিভিন্ন বিষয়ে ফৎওয়া প্রদান, 'নূরুন আলাদ দারব' শীর্ষক বেতার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শ্রোতাদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রদান, 'আল-কাছীম' এলাকার বিচারক, উনায়যার 'সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ পরিষদের' (هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر) সদস্য ও খতীবদের সাথে এবং বুরায়দা অঞ্চলের

১০. মাজমূউ ফাতাওয়া ও রাসায়িলু ফাযীলাতিশ শায়খ মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন (রিয়াদ : দারুছ ছুরাইয়া, ২য় প্রকাশ, ১৪১৪ হিঃ/১৯৯৪ খৃঃ), ১/৯; আল-জামি, পৃঃ ৪৮-৪৯।

১১. আব্দুর রহমান বিন ইউসুফ আর-রহমাহ, আল-ইনজায ফী তারজামাতিল ইমাম আব্দুল আযীয বিন বায (রিয়াদ : দারু ইবনিল জাওযী, ১৪২৮ হিঃ), পৃঃ ৯৫; আল-জামি, পৃঃ ৪৮; মাজমূউ ফাতাওয়া ও রাসাইল ১/১০; www.ibnothaimeen.com।

দাঈদের সাথে ইলমী আলোচনা প্রভৃতিভাবে তিনি দাওয়াতী কর্মতৎপরতা অব্যাহত রাখেন।[১২]

বিভিন্ন পরিষদের সদস্য : শিক্ষাদান ও দাওয়াতী কাজের প্রচণ্ড ব্যস্ততার মাঝেও তিনি ১৪০৭ হিজরী থেকে আমৃত্যু সঊদী আরবের সর্বোচ্চ ওলামা পরিষদ (هيئة كبار العلماء), ইমাম মুহাম্মাদ বিন সঊদ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা পরিষদ সদস্য, একই বিশ্ববিদ্যালয়ের আল-কাছীম শাখার শরী'আহ অনুষদের সদস্য সহ বিভিন্ন পরিষদের সদস্য হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।

শায়খের মাযহাব : শায়খ উছায়মীন (রহঃ) মাসআলা ইস্তিম্বাতের ক্ষেত্রে ফকীহ ও মুহাদ্দিছগণের নীতির সমন্বিত রূপের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন। তিনি হাম্বলী মাযহাবের মুকাল্লিদ ছিলেন না; বরং দলীলের আলোকে যে মতটি প্রাধান্যযোগ্য মনে করেছেন সেটিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। হাম্বলী মাযহাবের 'যাদুল মুসতাকনি' গ্রন্থের ভাষ্য 'আশ-শারহুল মুমতি'-এর শুধু 'পবিত্রতা' অধ্যায়ে ৮৯টি মাসআলায় হাম্বলী মাযহাবের বিপরীত মত প্রকাশ করেছেন। শায়খের জীবদ্দশায় ৮ খণ্ডে প্রকাশিত উক্ত গ্রন্থের মোট ৯৫০টি মাসআলায় তিনি হাম্বলী মাযহাবের বিরোধিতা করেছেন। তিনি বলতেন, شيخ الإسلام ابن تيمية محبوب إلينا، لكن الحق أحب إلينا منه 'শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়া আমাদের প্রিয়পাত্র। কিন্তু হক তাঁর চেয়ে আমাদের নিকট অনেক বেশি প্রিয়'।[১৩]

রচনাবলী : শায়খ উছায়মীন রচিত গ্রন্থ সংখ্যা শতাধিক। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল- মাজমূউ ফাতাওয়া ও রাসাইল (১৬ খণ্ড পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে। ৩০ খণ্ডে সমাপ্ত হওয়ার কথা), আশ-শারহুল মুমতি (৮ খণ্ড প্রকাশিত। ১৬ খণ্ডে সমাপ্ত হওয়ার কথা), আল-কাওলুল মুফীদ আলা কিতাবিত তাওহীদ (৩ খণ্ড), শারহু রিয়াযিছ ছালেহীন (৭ খণ্ড), শারহুল আকীদা আল-ওয়াসিতিয়্যাহ (২ খণ্ড), মাজালিসু শাহরি রামাযান, আল-মানহাজ লিমুরীদিল ওমরা ওয়াল হজ্জ প্রভৃতি।

মৃত্যু : বিশ্ববরেণ্য এই আলেমে দ্বীন ১৪২১ হিজরীর ১৫ই শাওয়াল মোতাবেক ২০০১ সালের ১০ই জানুয়ারী রোজ বুধবার মাগরিবের কিছুক্ষণ পূর্বে ৭৪ বছর বয়সে জেদ্দা নগরীতে ইন্তেকাল করেন। পরদিন মসজিদে হারামে ছালাতে জানাযা শেষে তাঁকে মক্কার 'আল-আদল' কবরস্থানে স্বীয় শিক্ষক শায়খ বিন বাযের পাশে দাফন করা হয়।[১৪]

১২. আল-জামি, পৃঃ ১১৩-২২, ১৪২-৪৬।

১৩. ঐ, পৃঃ ৭৬, ১০৩-১০৪।

১৪. আল-জামি, পৃঃ ১৭৯; www.ibnothaimeen.com।

ভূমিকা

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّه، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ.

وَأَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، أَرْسَلَهُ اللهُ تَعَالَى بِالْهُدَى وَدِيْنِ الْحَقِّ، فَبَلَّغَ الرِّسَالَةَ، وَأَدَّى الْأَمَانَةَ، وَنَصَحَ الْأُمَّةَ، وَجَاهَدَ فِي اللهِ حَقَّ جِهَادِهِ، وَتَرَكَ أُمَّتَهُ عَلَى مَحَجَّةٍ بَيْضَاءَ نَقِيَّةٍ، لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا، لاَ يَزِيْغُ عَنْهَا إِلاَّ هَالِكٌ.

وَخَلَفَهُ فِيْ أُمَّتِهِ خُلَفَاؤُهُ الرَّاشِدُوْنَ، الْأَئِمَّةُ الْمَهْدِيُّوْنَ، الَّذِيْنَ سَارُوْا فِي الْأُمَّةِ عَلَى نَهْجِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقِيْدَةً، وَعِبَادَةً، وَسُلُوْكًا، وَمُعَامَلَةً، وَدَعْوَةً إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَجِهَادًا فِيْ سَبِيْلِهِ، فَأَبَانَ اللهُ بِهِمِ الطَّرِيْقَ، وَأَنَارَ الظُّلْمَةَ، وَعَلَى رَأْسِهِمْ أَبُوْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، ثُمَّ عُمَرُ الْفَارُوْقُ، ثُمَّ عُثْمَانُ ذُو النُّوْرَيْنِ، ثُمَّ عَلِيُّ ابْنُ أَبِيْ طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ، اَلَّذِيْ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ بَعَثَهُ إِلَى خَيْبَرَ : أُنْفُذْ عَلَى رِسْلِكَ حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلاَمِ، وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللهِ فِيْهِ، فَوَاللهِ لَأَنْ يَّهْدِيَ اللهُ بِكَ رَجُلاً وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَّكُوْنَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ.[১৫]

أَمَّا بَعْدُ :

১৫. বুখারী, হাদীছ নং-২৯৪২, 'জিহাদ ও সিয়ার' অধ্যায়' 'রাসূল (ছাঃ) কর্তৃক মানুষকে ইসলামের দিকে আহবান' অনুচ্ছেদ; মুসলিম, হাদীছ নং-২৪০৬, 'ছাহাবীগণের মর্যাদা' অধ্যায়, 'আলী বিন আবূ তালেব (রাঃ)-এর মর্যাদা' অনুচ্ছেদ।

সম্মানিত ভ্রাতৃমণ্ডলী! সঊদী আরব ও অন্যান্য দেশে মুসলিম যুবকদের মধ্যে বরকতময় আন্দোলন ও তেজোদীপ্ত জাগরণের অগ্রগামী মানসিকতা সৃষ্টির মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহ্র উপর আল্লাহ যে অনুগ্রহ করেছেন, তা সকলের কাছে প্রস্ফুটিত হয়ে আছে। কুরআন ও সুন্নাহ্র আলোকে ইসলামী শরী'আতের দোরগোড়ায় পৌঁছাই এই সঠিক দৃষ্টিভঙ্গির মূল লক্ষ্য।

নিঃসন্দেহে বরকতময়-পবিত্র অন্যান্য আন্দোলন ও জাগরণের ন্যায় ইসলামী পুনর্জাগরণ ও আন্দোলনও শত্রুদের বিরোধিতার সম্মুখীন হবে। কারণ হকের দীপ্তি উদ্ভাসিত হওয়ার সাথে সাথে বাতিলের লেলিহান শিখাও প্রজ্জ্বলিত হয়ে ওঠে। কিন্তু আল্লাহ্র ভাষায় : يُرِيْدُوْنَ لِيُطْفِؤُوْا نُوْرَ اللهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللهُ مُتِمُّ نُوْرِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ. 'তারা মুখের ফুঁৎকারে আল্লাহ্র নূর নিভিয়ে দিতে চায় কিন্তু আল্লাহ তার নূর পূর্ণরূপে উদ্ভাসিত করবেন, যদিও কাফেররা তা অপছন্দ করে' *(ছফ ৮)*।

শুধু আমাদের দেশেই (সঊদী আরব) নয়; বরং সমগ্র মুসলিম বিশ্বে যুবক-যুবতীদের মাঝে যে পুনর্জাগরণ আমরা লক্ষ্য করছি- *আল-হামদুলিল্লাহ*, তাকে আল্লাহ্র রহমতে বিনির্মাণকারী ও উপকারী আন্দোলনে পরিণত করার জন্য কতিপয় বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন।

এই গ্রন্থে আমরা আল্লাহ্র সাহায্যপ্রার্থী হয়ে কিছু মূলনীতি আলোচনা করব ও কতিপয় দিকনির্দেশনা প্রদান করব, যাতে আল্লাহ্র রহমতে এই পুনর্জাগরণ ফলপ্রসূ, উপকারী ও বিনির্মাণকারী হয়।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে প্রার্থনা, তিনি যেন লেখক, পাঠক ও সকল মুসলিমের জন্য এসব বিষয়ে আলোকবর্তিকা ও দলীলের সন্নিবেশ ঘটান।

ইসলামী পুনর্জাগরণ
সফলতা লাভের গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতিসমূহ

প্রথম মূলনীতি

কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা (التمسك بالكتاب والسنة)

ভ্রাতৃমণ্ডলী! আমাদের জানা মতে ইসলামী পুনর্জাগরণ সকল মুসলিম দেশে পরিব্যাপ্ত। কিন্তু এই জাগরণ কুরআন ও সুন্নাহ্র সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক। কেননা ইসলামী পুনর্জাগরণ যদি এর উপর প্রতিষ্ঠিত না হয় তাহলে তা প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড় সদৃশ জাগরণ হবে, যা হয়ত গড়ার চেয়ে ভাঙবেই বেশি। কিন্তু কুরআন ও সুন্নাহ্র মজবুত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হলে মুসলিম উম্মাহ ও অন্যদের মাঝে এর কার্যকর প্রভাব পরিলক্ষিত হবে।

আমাদের সকলের ঐ দীর্ঘ ঘটনা জানা যেখানে আমরা দেখি যে, আবূ সুফইয়ান কাফের অবস্থায় সিরিয়ায় এসে তৎকালীন রোমের বাদশাহ হিরাক্লিয়াসের সাথে মিলিত হয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অবস্থা তথা আল্লাহ্র ইবাদত, মূর্তিপূজা পরিত্যাগ, উত্তম চরিত্র, আচার-আচরণ, সত্যবাদিতা, বিশ্বস্ততা, ওয়াদা পালন প্রভৃতি ইসলামী শরী'আত আনীত বিধি-বিধান উল্লেখ করেছিল। তখন হিরাক্লিয়াস আবূ সুফইয়ানকে বলেছিলেন, إِنْ كَانَ مَا تَقُوْلُ حَقًّا فَسَيَمْلِكُ مَا تَحْتَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ 'তুমি যা বলছ তা যদি সত্য হয়, তবে (জেনে রাখ!) তিনি অচিরেই আমার এ দু'পায়ের নিচের জায়গার অধিকারী হবেন' (অর্থাৎ সিরিয়া বিজয় করবেন)।[16]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আনীত ধর্মের প্রতি তখনও সমগ্র আরবের লোক বিশ্বাস স্থাপন করেনি। বরং তিনি তখনও মক্কা থেকে (মদীনায়) হিজরত করেননি এবং মক্কা বিজয়ও করেননি। এমতাবস্থায় কে কল্পনা করতে পারে যে, হিরাক্লিয়াসের মত প্রতাপশালী বাদশাহ এ ধরনের কথা বলবেন, 'তুমি যা বলছ তা যদি সত্য হয়, তাহলে (জেনে রাখ!) তিনি অচিরেই সিরিয়া বিজয় করবেন'!

হিরাক্লিয়াস যে বিষয়ের আশঙ্কা ব্যক্ত করেছিলেন তা কি সংঘটিত হয়েছিল, না হয়নি? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কি হিরাক্লিয়াসের অধীনস্থ এলাকা তথা সিরিয়া বিজয় করেছিলেন, না করেননি? তিনি [রাসূল (ছাঃ)] মৃত্যুবরণ করা পর্যন্ত সিরিয়া বিজিত

---

[16]. বুখারী, হাদীছ নং-৭, 'অহির সূচনা' অধ্যায়, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে কিভাবে অহি আসা শুরু হয়েছিল' অনুচ্ছেদ।

হয়নি। তাহলে কিভাবে তিনি সিরিয়া অধিকার করেছিলেন? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর দাওয়াতের মাধ্যমে সিরিয়া বিজয় করেছিলেন, তার উপস্থিতির মাধ্যমে নয়। কারণ তাঁর দাওয়াত এ পৃথিবীতে বাস্তবায়িত হয়েছিল এবং মূর্তিপূজা ও শিরকের মূলোৎপাটন করেছিল। আর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পর তাঁর দাওয়াত ও শরী'আতের মাধ্যমে খোলাফায়ে রাশেদীন সিরিয়া জয় করেছিলেন।

আমাদের বক্তব্য হল, মুসলিম উম্মাহ যদি আল্লাহ্‌র দ্বীনের দিকে প্রকৃত অর্থে প্রত্যাবর্তন করত, যদি মুসলিম শাসক ও জনসাধারণ সত্যিকার অর্থে আল্লাহ্‌র দ্বীনের দিকে ফিরে আসত এবং তারা মুমিনদেরকে বন্ধুরূপে এবং কাফেরদেরকে শত্রু রূপে গ্রহণ করত, তাহলে তারা সমগ্র পৃথিবীর মালিক হত। জাতীয়তাবাদ, ব্যক্তিত্ব বা নির্দিষ্ট গোত্রের দিকে সম্পৃক্ততার কারণে তারা বিজয়ী হত না; বরং আল্লাহ্‌র দ্বীন প্রচারের দায়িত্ব পালন করার কারণে বিজয়ী হত। আর আল্লাহ তা'আলা তাঁর দ্বীনকে (ইসলাম) সকল দ্বীনের উপর বিজয়ী করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন, هُوَ الَّذِىْ أَرْسَـــلَ رَسُـــوْلَهُ بِالْهُدَى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّـــهِ. 'তিনিই তাঁর রাসূলকে পথনির্দেশ ও সত্যধর্ম দিয়ে প্রেরণ করেছেন, যাতে একে সব ধর্মের উপর বিজয়ী করে দেন' *(ছফ ৯)*। যারা এই দ্বীনকে আঁকড়ে ধরে থাকবে তাদেরকে বিজয়ী করা এই দ্বীনকে বিজয়ী করার আবশ্যিক পূর্বশর্ত।

বন্ধুগণ! মুসলিম যুবকরা বর্তমানে যে নবজাগরণের নেতৃত্ব দিচ্ছে তা যদি কুরআন ও সুন্নাহ্‌র উপর প্রতিষ্ঠিত না হয়, তাহলে তা প্রলয়ংকরী ঝড়ের রূপ পরিগ্রহ করবে, যা গড়ার চেয়ে ভাঙবেই বেশি বলে আশঙ্কা জাগে। কিন্তু যদি বলা হয়, 'কুরআন ও সুন্নাহ্‌র দিকে ফিরে যাওয়ার পদ্ধতি কি'? (তার জবাবে আমরা বলব) **কুরআন মাজীদের দিকে ফিরে যাওয়ার পদ্ধতি হচ্ছে-** যখন মুসলমানেরা কুরআন মাজীদ গবেষণা করবে, অতঃপর উহার আনীত বিধানের প্রতি আমল করতে আগ্রহী হবে, (তখনই কুরআনের দিকে ফিরে যাওয়া সহজ হবে)। কেননা আল্লাহ বলেন, كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوْا آيَاتِه وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُوا الْأَلْبَـــابِ. 'এক কল্যাণময় কিতাব, ইহা আমি তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, যাতে মানুষ ইহার আয়াতসমূহ অনুধাবন করে এবং বোধশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ গ্রহণ করে উপদেশ' *(ছোয়াদ ২৯)*।

- 'যাতে মানুষ ইহার আয়াতসমূহ অনুধাবন করে'। আর আয়াতসমূহ অনুধাবন করা অর্থ বুঝার দিকে পৌঁছিয়ে দেয়।
- 'এবং বোধশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ গ্রহণ করে উপদেশ'। আর উপদেশ গ্রহণ করার অর্থই হচ্ছে কুরআনের (বিধি-বিধানের) প্রতি আমল করা।

এই অর্থ বা এই তাৎপর্য বুঝানোর জন্যই কুরআন মাজীদ অবতীর্ণ হয়েছে। কুরআন যেহেতু এজন্য অবতীর্ণ হয়েছে, সেহেতু তা অনুধাবন করা ও উহার

অর্থ জানার জন্য কুরআনের দিকে ফিরে যাওয়া অতঃপর কুরআনের আনীত বিধানকে বাস্তবায়ন করা আমাদের কর্তব্য। আল্লাহ্‌র কসম! এর মাঝেই নিহিত আছে ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ। মহান আল্লাহ বলেন, فَمَنِ اتَّبَـــعَ هُدَاىَ فَلاَ يَضِلُّ وَلاَ يَشْقَى. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِىْ فَإِنَّ لَهُ مَعِيْشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَـــى. 'যে আমার পথ অনুসরণ করবে সে বিপথগামী হবে না ও দুঃখ-কষ্ট পাবে না। আর যে আমার স্মরণে বিমুখ থাকবে, অবশ্যই তার জীবন-যাপন হবে সংকুচিত এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন উত্থিত করব অন্ধ অবস্থায়' *(ত্বহা ১২৩-২৪)*।

সুতরাং দরিদ্র হলেও মুমিনের চেয়ে আপনি কস্মিনকালেও কাউকে স্বচ্ছল, প্রশস্ত হৃদয় সম্পন্ন এবং আত্মিক প্রশান্তির অধিকারী পাবেন না। মুমিনই মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রশস্ত হৃদয় সম্পন্ন ও প্রশান্তির অধিকারী। মহান আল্লাহ্‌র বাণী পাঠ করুন, مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَاكَـــانُوْا يَعْمَلُـــوْنَ. 'মুমিন হয়ে পুরুষ ও নারীর মধ্যে যে কেউ সৎকর্ম করবে তাকে আমি নিশ্চয়ই পবিত্র জীবন দান করব এবং তাদেরকে তাদের কর্মের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার প্রদান করব' *(নাহল ৯৭)*।

'পবিত্র জীবন' কী? তা কি অধিক ধন-সম্পদ? নাকি অধিক সন্তান-সন্ততি? না দেশে শান্তি-নিরাপত্তায় বসবাস করা? না, পবিত্র জীবন এগুলোর কোনটিই নয়; বরং পবিত্র জীবন হচ্ছে প্রশস্ত হৃদয় ও আত্মিক প্রশান্তি। এমনকি মানুষ (মুমিন) যদি খুব দুঃখ-কষ্টেও নিপতিত থাকে, তবুও সে আত্মিক প্রশান্তি ও প্রশস্ত হৃদয়ের অধিকারী হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ، إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلاَّ لِلْمُـــؤْمِنِ، إِنْ أَصَـــابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ.

'ঈমানদারের ব্যাপারটাই অদ্ভুত। বস্তুত ঈমানদারের প্রতিটি কাজই তার জন্য কল্যাণকর। আর এটা কেবলমাত্র মুমিনেরই বৈশিষ্ট্য। তার স্বচ্ছলতা অর্জিত হলে সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, এটা তার জন্য কল্যাণকর। পক্ষান্তরে তার উপর কোন বিপদ আসলে সে ধৈর্যধারণ করে। এটাও তার জন্য কল্যাণকর'।[১৭]

---

[১৭]. মুসলিম, হাদীছ নং-২৯৯৯, 'আধ্যাত্মিকতা ও মনগলানো উপদেশমালা' অধ্যায়, 'মুমিনের সকল কাজই কল্যাণকর' অনুচ্ছেদ।

কাফের যদি বিপদের সম্মুখীন হয় তবে কি সে ধৈর্যধারণ করতে পারে? না; বরং সে চিন্তিত হয় এবং দুনিয়া তার জন্য সংকীর্ণ হয়ে যায়। কখনো সে আত্মহত্যা করে নিজেকে নিঃশেষ করে দেয়। কিন্তু মুমিন ধৈর্যধারণ করে এবং প্রশস্ততা ও আত্মিক প্রশান্তির দৃষ্টিকোণ থেকে ধৈর্যের স্বাদ আস্বাদন করে। সেজন্য তার জীবন হয় পবিত্র এবং 'আমি অবশ্যই তাকে পবিত্র জীবন দান করব' মহান আল্লাহ্‌র এই বাণী তার জীবনীশক্তি হিসেবে পরিগণিত হয়।

সমকালীন মিসরের প্রধান বিচারপতি হাফেয ইবনু হাজার আসকালানী (রহঃ)-এর জীবনী রচয়িতা কতিপয় ঐতিহাসিক উল্লেখ করেছেন যে, তিনি কর্মস্থলে আসতেন এমন গাড়িতে চড়ে, যেটিকে ঘোড়া অথবা খচ্চর টেনে আনত। একদিন তিনি মিসরে এক ইহুদী তেল বিক্রেতার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। (আর সাধারণত তেল বিক্রেতাদের পোষাক হয় ময়লাযুক্ত)। ইত্যবসরে ইহুদী এসে গাড়ীর বহর থামিয়ে হাফেয ইবনু হাজারকে বলল, তোমাদের নবী (ছাঃ) বলেছেন, اَلدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّــــةُ الْكَــــافِرِ. 'দুনিয়া মুমিনের জন্য জেলখানা আর কাফেরের জন্য জান্নাত স্বরূপ'।[১৮] অথচ তুমি মিসরের প্রধান বিচারপতি হয়েও এই গাড়ির বহর নিয়ে চলছ এবং এই নে'মত ভোগ করছ। আর আমি (ইহুদী) দুঃখ-কষ্ট ও দুর্ভোগের মধ্যে আছি। জবাবে হাফেয ইবনু হাজার বললেন, যদি তোমার কথামত আমি বিলাসিতা ও স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে থাকি, তবুও তা জান্নাতের নে'মতের তুলনায় জেলখানা রূপে বিবেচিত হবে। আর তুমি যে দুর্ভোগের মধ্যে আছ, তা জাহান্নামের শাস্তির বিবেচনায় জান্নাত রূপে গণ্য হবে। একথা শুনে তৎক্ষণাৎ ইহুদী বলল, أَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ. 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন (প্রকৃত) উপাস্য নেই এবং আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ আল্লাহ্‌র রাসূল' এবং ইসলাম গ্রহণ করল।

কাজেই মুমিন যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন তিনি কল্যাণের মধ্যে আছেন। তিনিই ইহকাল ও পরকালে লাভবান হয়েছেন। আর কাফের অকল্যাণের মধ্যে আছে। সে দুনিয়া ও আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, 'মহাকালের শপথ! মানুষ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত, কিন্তু তারা নয়, যারা ঈমান আনে, সৎকর্ম সম্পাদন করে, পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয় ও ধৈর্যের উপদেশ দেয়' *(আছর ১-৩)*।

---

[১৮]. মুসলিম, হাদীছ নং-২৯৫৬, 'আধ্যাত্মিকতা ও মনগলানো উপদেশমালা' অধ্যায়, 'দুনিয়া মুমিনের জন্য জেলখানা আর কাফেরের জন্য জান্নাত' অনুচ্ছেদ।

সুতরাং কাফেররা, আল্লাহ্‌র দ্বীনকে ধ্বংসকারীরা এবং ভোগ-বিলাসে উন্মত্তরা যদিও সুদৃঢ় প্রাসাদ ও সুরম্য-হরম্য অট্টালিকা নির্মাণ করে এবং দুনিয়া তাদের জন্য পত্র-পল্লবে সুশোভিত হয়, তবুও বাস্তবে তারা জাহান্নামে রয়েছে। এমনকি জনৈক আলেম বলেছেন, لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالـــسيوف 'যদি রাজা-বাদশাহ ও তাদের সন্তানেরা জানত যে, আমরা কী অবস্থায় রয়েছি, তাহলে তারা আমাদেরকে তরবারি দিয়ে প্রহার করত'।

পক্ষান্তরে মুমিনরা আল্লাহ্‌র সাথে মুনাজাত ও তার যিকিরে আনন্দিত হয়। তারা আল্লাহ্‌র ফায়ছালা ও তাকদীরকে অবনতমস্তকে মেনে নেয়। যদি তারা বিপদাপদে নিপতিত হয়, তাহলে ধৈর্যধারণ করে এবং আনন্দিত হলে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। দুনিয়াদারদের তুলনায় তারা অত্যন্ত স্বাচ্ছন্দ্যে থাকে। কেননা আল্লাহ্‌র বর্ণনা অনুযায়ী তাদের (দুনিয়াদারদের) গুণ হচ্ছে- فَإِنْ أُعْطُوْا مِنْهَا رَضُوْا وَإِنْ لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُوْنَ. 'উহার (ছাদাক্বার) কিছু তাদেরকে দেয়া হলে তারা পরিতুষ্ট হয়, আর কিছু তাদেরকে না দেয়া হলে তৎক্ষণাৎ তারা বিক্ষুব্ধ হয়' *(তওবা ৫৮)*।

বন্ধুরা! আল্লাহ্‌র কিতাব (কুরআন) আমাদের সম্মুখে বিদ্যমান, যাতে আমরা তার দিকে ফিরে যাই, তা অনুধাবন করি এবং এর বিধি-বিধানের প্রতি আমল করি।

সুন্নাহ্‌র দিকে ফিরে যাওয়ার পদ্ধতি :

আল্লাহ্‌র রাসূলের সুন্নাত আমাদের কাছে প্রমাণিত ও সংরক্ষিত আছে। *ফালিল্লা-হিল হামদ।* এমনকি ওলামায়ে কেরাম কোনটি তাঁর ছহীহ সুন্নাহ ও কোনটি মাওযূ বা জাল তা বর্ণনা করেছেন। ফলে হাদীছ সুস্পষ্ট ও সংরক্ষিত হয়ে গেছে। যে কেউ সম্ভব হলে হাদীছের গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন করে তা অনুধাবন করতে পারে। আর সেই যোগ্যতা না থাকলে ওলামায়ে কেরামকে জিজ্ঞেস করে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে।

কিন্তু যদি কেউ বলে, আমরা অধিকাংশ লোককে মাযহাবী গ্রন্থগুলোর অনুসরণ করতে দেখি এবং তারা বলে, আমি অমুক মাযহাবের অনুসারী! আমি তমুক মাযহাবের অনুসারী!! এমনকি আপনি কোন ব্যক্তিকে কোন ফৎওয়া প্রদান করে বলবেন যে, নবী করীম (ছাঃ) এরূপ বলেছেন। তখন সে বলবে, আমি হানাফী মাযহাবের অনুসারী, আমি মালেকী মাযহাবের অনুসারী, আমি শাফেঈ মাযহাবের অনুসারী, আমি হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী... ইত্যাদি! এমতাবস্থায় আপনি কুরআন-সুন্নাহর দিকে ফিরে যাওয়ার যে কথা বলছেন সে ব্যাপারে কিভাবে সমন্বয় সাধন করবেন?

এর জবাবে আমরা তাদেরকে বলব, আমরা সবাই বলি, 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ব্যতীত (প্রকৃত) উপাস্য কেউ নেই এবং আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ আল্লাহ্র রাসূল'। 'মুহাম্মাদ (ছাঃ) আল্লাহ্র রাসূল'-এ কথার সাক্ষ্য প্রদানের অর্থ কি? ওলামায়ে কেরাম বলেন, এর অর্থ হচ্ছে- طاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وتصديقه فيما أخبر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. 'তিনি [রাসূল (ছাঃ)] যে বিষয়ে আদেশ দিয়েছেন তার আনুগত্য করা, যে বিষয় থেকে নিষেধ করেছেন ও ধমক দিয়েছেন তাথেকে বিরত থাকা, যে বিষয়ে সংবাদ প্রদান করেছেন তাকে সত্য বলে বিশ্বাস করা এবং তাঁর নির্দেশিত পন্থায় আল্লাহ্র ইবাদত করা'। 'মুহাম্মাদ (ছাঃ) আল্লাহ্র রাসূল' এ কথার সাক্ষ্য প্রদানের অর্থ এটাই।

যদি কেউ বলে, আমি অমুক মাযহাবের অনুসারী, আমি তমুক মাযহাবের অনুসারী, তাহলে আমরা তাকে বলব, এটা আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর কথা। সুতরাং অন্য কারো কথার দ্বারা তার বিরোধিতা কর না। এমনকি মাযহাবের ইমামগণও তাদের অন্ধ তাকলীদ করতে নিষেধ করে বলেছেন, متى تبين الحق فإن الواجب الرجـــوع إليه. 'হক প্রকাশিত হলে তার দিকে প্রত্যাবর্তন করা ওয়াজিব বা অত্যাবশ্যক'।

সুতরাং যে ভাই অমুকের অথবা তমুকের মাযহাবের দোহাই পেড়ে আমাদের বিরোধিতা করে তাকে বলব, তুমি ও আমরা সবাই এ মর্মে সাক্ষ্য দেই যে, মুহাম্মাদ (ছাঃ) আল্লাহ্র রাসূল। আর এই সাক্ষ্য প্রদানের দাবী হচ্ছে, আমরা রাসূল (ছাঃ) ব্যতীত অন্য কারো অনুসরণ করব না। আর সুন্নাহ আমাদের সামনে সুস্পষ্ট। তবে একথার দ্বারা আমি ফকীহ ও মুহাক্কিক ওলামায়ে কেরাম রচিত গ্রন্থাবলীর দিকে ফিরে যাওয়ার গুরুত্বহীনতা বুঝাচ্ছি না; বরং উপকৃত হওয়ার জন্য এবং দলীলভিত্তিক মাসআলা উদ্ভাবনের পদ্ধতি জানার জন্য তাদের গ্রন্থাবলীর দিকে ফিরে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই।

এজন্য যারা ওলামায়ে কেরামের কাছে শরী'আতের জ্ঞান অর্জন করে না, তাদেরকে আমরা অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতিতে নিমজ্জিত হতে দেখি। কারণ যেকোন বিষয়ে যতটুকু গভীর অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা-ভাবনা করা দরকার তার চেয়ে তারা হালকা দৃষ্টিতে বিচার-বিশ্লেষণ করে। উদাহরণ স্বরূপ- তারা ছহীহ বুখারী অধ্যয়ন করে তাতে যে হাদীছ রয়েছে তার আলোকে ফৎওয়া দেয়। অথচ হাদীছের মধ্যে আম, খাছ, মুতলাক, মুকাইয়াদ ও মানসূখ রয়েছে। কিন্তু তারা সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করে না। ফলে কখনো কখনো তা মারাত্মক পথভ্রষ্টতার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। মোদ্দাকথা, আমরা আমাদের পুনর্জাগরণকে দু'টি ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করব। তা হল কুরআন

ও সুন্নাহ। এ দু'টির উপর কারো কথাকে প্রাধান্য দেব না। তিনি যেই হোন না কেন।

দ্বিতীয় মূলনীতি

জ্ঞান ও দূরদৃষ্টি (العلم والبصيرة)

যেসব বিষয়ের উপর ইসলামী পুনর্জাগরণ সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়া দরকার তন্মধ্যে অন্যতম হল জ্ঞান। অর্থাৎ ইসলামী শরী'আতের দু'টি মূল উৎসের সাথে সংশ্লিষ্ট জ্ঞান। আর উৎস দু'টি হচ্ছে, কুরআন ও সুন্নাহ। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الـذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَـيْهِمْ. 'এবং তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করেছি, মানুষকে সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেবার জন্য যা তাদের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছিল' *(নাহল ৪৪)*। তিনি আরো বলেন,

وَأَنْزَلَ اللهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا.

'আল্লাহ তোমার প্রতি কিতাব ও হিকমত অবতীর্ণ করেছেন এবং তুমি যা জানতে না তা তোমাকে শিক্ষা দিয়েছেন, তোমার প্রতি আল্লাহ্র মহানুগ্রহ রয়েছে' *(নিসা ১১৩)*।

সুতরাং ইলম বা জ্ঞান হচ্ছে দাওয়াতের ভিত্তি ও উপাদান। জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত না হলে কোন দাওয়াতই এমনভাবে সম্পন্ন হতে পারে না, যা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে। ইমাম বুখারী (রহঃ) তাঁর ছহীহ বুখারীতে بَابُ الْعِلْمِ قَبْلَ الْقَـوْلِ وَالْعَمَـلِ (বলা ও আমল করার পূর্বে জ্ঞানার্জন করা আবশ্যক) শিরোনামে অনুচ্ছেদ রচনা করেছেন এবং আল্লাহ্র বাণী- فَاعْلَمْ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ 'সুতরাং জেনে রাখ, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন (হক) উপাস্য নেই, তোমার ত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর' *(মুহাম্মাদ ১৯)* দ্বারা দলীল পেশ করেছেন।

জ্ঞানহীন প্রত্যেকটি দাওয়াতে ত্রুটি-বিচ্যুতি ও ভ্রষ্টতা থাকবেই। এজন্য নবী করীম (ছাঃ) এ বিষয় থেকে সতর্ক করেছেন যে, যখন ওলামায়ে কেরামের ইন্তেকালের ফলে মূর্খ লোকেরা বেঁচে থেকে না জেনে ফৎওয়া প্রদান করবে, তখন তারা নিজেরা পথভ্রষ্ট হবে এবং অন্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করবে।[১৯]

---

[১৯]. আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আছ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'আল্লাহ তাঁর বান্দাদের অন্তর থেকে ইলম উঠিয়ে নেন না, কিন্তু দ্বীনের আলেমদের উঠিয়ে নেয়ার মাধ্যমে ইলম উঠিয়ে নেন। এমনকি যখন কোন আলেম অবশিষ্ট থাকবে না, তখন লোকেরা মূর্খদেরকেই নেতা বানিয়ে নিবে। তাদের জিজ্ঞেস করা হলে না

ইসলামী পুনর্জাগরণ প্রত্যাশী অনেক দ্বীনী ভাইকে আমরা ধর্মীয় আবেগে তাড়িত দেখি। নিঃসন্দেহে এটা ভাল দিক। কারণ আগ্রহ ও আবেগ না থাকলে অগ্রগামিতা অর্জিত হয় না। কিন্তু শুধু আবেগই যথেষ্ট নয়; বরং অবশ্যই (তার সাথে) এমন জ্ঞান থাকতে হবে, যার ভিত্তিতে দাওয়াত ও আমলের ক্ষেত্রে মানুষ পরিচালিত হবে। এজন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, بَلِّغُوْا عَنِّىْ وَلَوْ آيَةً 'একটি আয়াত হলেও আমার পক্ষ থেকে প্রচার কর'।[২০] রাসূল (ছাঃ)-এর শরী'আত সম্পর্কে যতটুকু আমরা জেনেছি কেবল সেটুকুই তার পক্ষ থেকে প্রচার করা সম্ভব। কারণ তাঁর বাণী- 'আমার পক্ষ থেকে প্রচার কর'-এর অর্থ হচ্ছে- তাঁর মুখনিঃসৃত বাণী প্রচার করার জন্য তিনি আমাদেরকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করেছেন।

সুতরাং যে বিষয়ে আহ্বানকারী (মানুষকে) আহ্বান করবেন, সে বিষয়ে তার কুরআন-সুন্নাহর উপর সুপ্রতিষ্ঠিত বিশুদ্ধ জ্ঞান থাকতে হবে। আর কুরআন-সুন্নাহ ব্যতীত অন্য সকল অর্জিত জ্ঞানকে প্রথমত এতদুভয়ের সামনে পেশ করতে হবে। এরপর তা হয়ত কুরআন-সুন্নাহ্র অনুকূলে হবে, না হয় প্রতিকূলে। যদি অনুকূলে হয় তবে তা গ্রহণীয় হবে। আর যদি প্রতিকূলে হয় তাহলে প্রবক্তার দিকে তাকে ফিরিয়ে দেওয়া আবশ্যক হবে অর্থাৎ প্রত্যাখ্যাত হবে, তিনি যেই হোন না কেন। ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, يُوْشِكُ أَنْ تَنْـزِلَ عَلَـيْكُمْ حِجَارَةٌ مِّنَ السَّمَاءِ أَقُوْلُ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ وَتَقُوْلُوْنَ: قَالَ أَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ. 'তোমাদের উপর অচিরেই আকাশ থেকে পাথর বর্ষিত হবে। কারণ আমি বলছি, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন। অথচ তোমরা বলছ, আবূবকর ও ওমর (রাঃ) বলেছেন'। আবূবকর ও ওমর (রাঃ)-এর যে অভিমত রাসূল (ছাঃ)-এর অভিমতের বিরোধী সেক্ষেত্রে যদি একথা প্রযোজ্য হয়, তাহলে তাঁরা (আবূবকর ও ওমর) ব্যতীত ইলম, তাকওয়া, রাসূলের সাহচর্য ও খেলাফতের দিক দিয়ে যে নিম্নস্তরের তার বক্তব্যের ব্যাপারে তোমাদের কী অভিমত। এক্ষণে উক্ত ব্যক্তির বক্তব্য যদি কুরআন-সুন্নাহর বিরোধী হয় তাহলে তা নিঃসন্দেহে পরিত্যাজ্য। মহান আল্লাহ তাইতো বলেছেন,

---

জানলেও তারা ফৎওয়া প্রদান করবে। ফলে তারা নিজেরাও পথভ্রষ্ট হবে এবং অন্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করবে। দ্রঃ বুখারী, হাদীছ নং-১০০, 'ইলম' অধ্যায়, 'কীভাবে ধর্মীয় জ্ঞান তুলে নেয়া হবে' অনুচ্ছেদ; মুসলিম,হাদীছ নং-২৬৭৩, 'ইলম' অধ্যায়, 'শেষ যামানায় ইলম উঠিয়ে নেয়া, মূর্খতা বৃদ্ধি পাওয়া ও ফিতনা প্রকাশিত হওয়া'' অনুচ্ছেদ।

[২০]. বুখারী, হাদীছ নং-৩৪৬১, 'নবীদের কাহিনী' অধ্যায়, 'বনী ইসরাঈল সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে' অনুচ্ছেদ।

فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ.

'সুতরাং যারা তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তারা সতর্ক হৌক যে, বিপর্যয় তাদের উপর আপতিত হবে অথবা আপতিত হবে তাদের উপর মর্মন্তুদ শাস্তি' *(নূর ৬৩)*। ইমাম আহমাদ (রহঃ) বলেন, أتدرى ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعلـــه إذا رد بعض قوله أن يقع فى قلبه شيء من الزيغ فيهلـــك. 'তোমরা কি জান ফিতনা কী? ফিতনা হচ্ছে শিরক। যখন তাঁর [রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর] কোন কথাকে প্রত্যাখ্যান করা হবে, তখন প্রত্যাখ্যানকারীর মনে বক্রতা স্থান পাবে। ফলে সে ধ্বংস হবে'।

জ্ঞানহীন দাওয়াত মূর্খতার উপর ভিত্তিশীল দাওয়াত। আর মূর্খতার উপর ভিত্তিশীল দাওয়াতে লাভের চেয়ে ক্ষতিই বেশি। কারণ এক্ষেত্রে দাঈ (দাওয়াতদাতা) নিজেকে দিকনির্দেশক ও পথপ্রদর্শক রূপে নিয়োজিত করেন। যদি তিনি মূর্খ হন তাহলে সেই মূর্খতার দ্বারা তিনি নিজে পথভ্রষ্ট হন ও অন্যকে পথভ্রষ্ট করেন *(না'ঊযুবিল্লাহ)*। তার এই মূর্খতা হয় নিরেট মূর্খতা। আর নিরেট মূর্খতা নগণ্য মূর্খতার চেয়ে অনেক বেশি ক্ষতিকর। কারণ নগণ্য মূর্খতা মূর্খকে আটকিয়ে রাখে এবং সে কথা বলে না। এ জাতীয় মূর্খতা জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে বিদূরিত হতে পারে। কিন্তু যত সমস্যা গণ্ডমূর্খের বেলায়। সে চুপ থাকে না; বরং কোন বিষয়ে জানা না থাকলেও সে কথা বলবেই। আর তখনই সে আলোকিতকারীর চেয়ে ঢের ধ্বংসকারী রূপেই প্রতীয়মান হবে।

বন্ধুগণ! না জেনে আল্লাহ্‌র পথে দাওয়াত দেওয়া রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও তাঁর অনুসারীদের আদর্শের পরিপন্থী। মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করুন মহান আল্লাহ্‌র বাণী, যেখানে তিনি তাঁর নবীকে আদেশ দিয়ে বলছেন, قُلْ هَذِهِ سَبِيْلِىْ أَدْعُوْ إِلَى اللهِ عَلَى بَصِيْرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِىْ وَ سُبْحَانَ اللهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُـــشْرِكِيْنَ. 'বলুন! এটাই আমার পথ! আমি ও আমার অনুসারীগণ ডাকি আল্লাহ্‌র দিকে জাগ্রত জ্ঞান সহকারে। আল্লাহ মহিমান্বিত এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই' *(ইউসুফ ১০৮)*।

উক্ত আয়াতে মহান আল্লাহ বলেছেন, 'আমি ও আমার অনুসারীগণ ডাকি আল্লাহ্‌র দিকে জাগ্রত জ্ঞান সহকারে'। অর্থাৎ যিনি তাঁর [রাসূল (ছাঃ)-এর] অনুসরণ করবেন তাকে অবশ্যই জাগ্রত জ্ঞান সহকারে আল্লাহ্‌র দিকে ডাকতে হবে, মূর্খতার সাথে নয়।

হে দাঈ! আল্লাহ্‌র বাণী **'জাগ্রত জ্ঞান সহকারে'** চিন্তা করুন। অর্থাৎ তিনটি বিষয়ে জাগ্রত জ্ঞান সহকারে :

প্রথমত : দাঈ যে বিষয়ে আহ্বান করবেন সে বিষয়ে তাকে জাগ্রত জ্ঞান সম্পন্ন হতে হবে

এটা এভাবে যে, যে বিষয়ে তিনি আহ্বান করবেন, সে বিষয়ে শারঈ বিধান সম্পর্কে জ্ঞাত থাকবেন। কারণ তিনি কোন বিষয় অপরিহার্য মনে করে সেদিকে আহ্বান করলেন, অথচ দেখা গেল শরী'আতে তা অপরিহার্য নয়। এর ফলে আল্লাহ্‌র বান্দাদের জন্য তিনি এমন বিধান বাধ্যতামূলক করে দিলেন, যা আল্লাহ তাদের জন্য বাধ্যতামূলক করেননি। পক্ষান্তরে কখনো হয়ত তিনি কোন বিষয়কে হারাম জেনে তা বর্জনের জন্য আহ্বান জানালেন, অথচ তা ইসলামী শরী'আতে হারাম নয়। ফলে তিনি আল্লাহ্‌র বান্দাদের জন্য এমন বিষয় হারাম সাব্যস্ত করলেন, যা আল্লাহ তাদের জন্য হালাল করেছেন।

আমরা অনেক সময় দাঈদেরকে সব নতুন জিনিস পরিত্যাগের আহ্বান জানাতে শুনি। যদিও দেখা যায় ঐ নতুন জিনিসের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য এবং তাতে শারঈ বিধি-নিষেধ নেই। যেমন- দাঈ বলেন, টেপরেকর্ডারে রেকর্ডকৃত কুরআন তেলাওয়াত শ্রবণ কর না। (যদি তাকে বলা হয়) কেন? উত্তরে তিনি বলেন, কেননা এটা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও তাঁর ছাহাবায়ে কেরামের যুগে ছিল না। সুতরাং তা বিদ'আত (নব আবিষ্কৃত বস্তু)। আর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ 'প্রত্যেক নব আবিষ্কৃত বস্তুই ভ্রষ্টতা'।[২১]

উক্ত দাঈ আল্লাহ্‌র পথে দাওয়াত দিলেন, কিন্তু তিনি এমন বিষয়ে দাওয়াত দিলেন যে সম্পর্কে তার সঠিক জ্ঞান নেই। কারণ টেপরেকর্ডার শ্রুত কথা সংরক্ষণের একটি মাধ্যম। আর মাধ্যম উদ্দিষ্ট বিষয়ের মত নয়। মাধ্যমসমূহের জন্য উদ্দিষ্ট বিষয়ের বিধান কার্যকর হয়। (অর্থাৎ এখানে কুরআন তেলাওয়াত শুনাটাই মুখ্য বিষয়; টেপরেকর্ডার নয়)।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে কি লাইব্রেরী, ছাপাখানা ও বইপত্র সংরক্ষণের জন্য গুদাম ছিল? উত্তর : না। বরং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে হিজরী সন-তারিখেরও অস্তিত্ব ছিল না। ১৬ হিজরীতে ওমর (রাঃ) প্রথম হিজরী সন-তারিখ প্রবর্তন করেন। তাহলে কী আমরা এখন বলব, হিজরী সন-তারিখের প্রয়োগ বিদ'আত, জায়েয নয়? না। সারকথা, যে বিষয়ে আমরা মানুষদেরকে আহ্বান করব সে বিষয়ে আমাদের যথাযথ জ্ঞান থাকতে হবে।

[২১]. মুসলিম, হাদীছ নং-৮৬৭, 'জুম'আহ' অধ্যায়, 'খুৎবা ও ছালাত সংক্ষিপ্তকরণ' অনুচ্ছেদ।

পক্ষান্তরে এ জাতীয় বিষয়ে অনেকে বাড়াবাড়ি করে বলে, মাইক্রোফোনের নিকট রেকর্ডকৃত আযানের ক্যাসেট রেখে দিয়ে আযান প্রচার করো। এটা প্রথম প্রকারের বিপরীত। এ ব্যক্তি চায় না, আমরা (মুওয়ায্যিনের কণ্ঠে ধ্বনিত) আযানের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র ইবাদত করি; বরং সে চায়, আমরা মানুষদেরকে এমন মুওয়ায্যিনের আযান শুনানোর জন্য মাইক্রোফোন স্থাপন করি, যিনি হয়ত মারা গেছেন। এটাও ভুল। মোদ্দাকথা, দাঈ যে বিষয়ে দাওয়াত দিবেন সে বিষয়ে তাকে সঠিক জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে।

অনুরূপভাবে কতিপয় মানুষ কোন বিষয়কে ওয়াজিব বলে ধারণা করে। হয়তবা সে ভুল ইজতিহাদের কারণে এরূপ বিশ্বাস করে। যদি সে এখানেই ক্ষ্যান্ত থাকত তাহলে কোন কথাই ছিল না। কিন্তু সে এহেন মনগড়া ব্যাখ্যা বা ভিত্তিহীন সংশয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত বিশ্বাসকে 'আল-ওয়ালা'[২২] (الولاء) ও 'আল-বারা' (البراء) তথা কারো সাথে সখ্যতা ও কারো সাথে বিদ্বেষ পোষণের মাধ্যম বানিয়ে নেয়। এটাই হচ্ছে সমস্যা! যখন কোন মানুষ তার মতামতের প্রতিকূলে থাকে, তখন সেই ব্যক্তিকে সে অপছন্দ ও ঘৃণা করে। যদিও কুরআন-সুন্নাহর দলীলের আলোকে তার মতামত ভুল প্রমাণিত হয়। আর তার মতের অনুকূলে থাকলে সে তার প্রিয়পাত্র হয়ে

[২২]. الولاء শব্দের আভিধানিক অর্থ : মৈত্রী, বন্ধুত্ব, ঘনিষ্ঠতা, নৈকট্য প্রভৃতি। আর البراء শব্দের অর্থ : অব্যাহতি, নিস্কৃতি, দায়মুক্তি প্রভৃতি। الولاء ও البراء ইসলামী আকীদার অবিচ্ছেদ্য অনুষঙ্গ। সঊদী আরবের সর্বোচ্চ ওলামা পরিষদ সদস্য ড. ছালেহ বিন ফাওযান আলে ফাওযান বলেন, من أصول العقيدة الإسلامية أنه يجب على كل مسلم يدين بهذه العقيدة أن يوالى أهلها ويعادى أعداءها فيحب أهل التوحيد والإخلاص ويواليهم، ويبغض أهل الإشراك ويعاديهم، 'ইসলামী আকীদার অন্যতম মূলনীতি হচ্ছে- প্রত্যেক মুসলমানকে এই আকীদা পোষণ করা যে, সে মুসলমানদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করবে এবং ইসলামের শত্রুদের সাথে বিদ্বেষ পোষণ করবে। ফলে সে তাওহীদবাদী একনিষ্ঠ ব্যক্তিদেরকে ভালবাসবে এবং তাদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করবে। আর মুশরিকদেরকে ঘৃণা করবে এবং তাদের সাথে শত্রুতা পোষণ করবে'। দ্রঃ ড. ছালেহ বিন ফাওযান আলে ফাওযান, আল-ওয়ালা ওয়াল বারা ফিল-ইসলাম (সংযুক্ত আরব আমিরাত : দারুল ফাতহ, ১৪১৪ হিঃ/ ১৯৯৪ খৃঃ), পৃঃ ৩। আল্লাহ তা'আলা কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন যেমন হারাম করেছেন (মায়েদা ৫১, মুমতাহিনা ১, তওবা ২৩, মুজাদালাহ ২২), তেমনি মুমিনদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপনকে আবশ্যক করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের বন্ধু তো আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মুমিনগণ- যারা বিনত হয়ে ছালাত ক্বায়েম করে ও যাকাত দেয়' (মায়েদা ৫৫)। সুতরাং কোন অবস্থায়ই স্রেফ যিদ, কপোলকল্পিত ব্যাখ্যা বা মাযহাবী গোঁড়ামীবশত কোন মুসলমানের সাথে বিদ্বেষ পোষণ করা যাবে না। বরং মুমিনদের বন্ধুত্ব ও শত্রুতার ভিত্তি হবে- 'আল্লাহ্‌র জন্য ভালবাসা এবং আল্লাহ্‌র জন্য শত্রুতা' (الحب فى الله والبغض فى الله)।-অনুবাদক

যায়। যদিও উক্ত ব্যক্তির মতের সাথে ঐকমত্য পোষণকারী ব্যক্তি বিদ'আতী হয়। আর এটা মারাত্মক সমস্যা!!

আমি এই ব্যাপারে সবিস্তারে আলোচনা করছি না। তবে অনেক যুবকের মাঝে এ প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। কতিপয় যুবক অমুককে পছন্দ করে এবং অমুককে অপছন্দ করে। তারা অমুককে পছন্দ করে এজন্য যে, তিনি তাদেরকে তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী যা সত্য তার অনুকূলে ফৎওয়া দিয়েছেন। আর অমুককে অপছন্দ করে এজন্য যে, তিনি তাদের ধারণা অনুযায়ী যা না-হক তার পক্ষে ফৎওয়া দিয়েছেন। এটা ভুল।

মানুষের কাছে প্রশংসিত অথবা তাদের প্রিয়পাত্র অথবা ঘৃণার পাত্র হবার জন্য মুফতী ফৎওয়া প্রদান করেন না; বরং তিনি তার ইলম অনুযায়ী যা শরী'আত বিবেচনা করেন সে অনুযায়ী ফৎওয়া প্রদান করেন। মুফতী কোন বিষয়ের ব্যাখ্যা প্রদান করেন? তিনি আল্লাহ্‌র দ্বীন ও তার বিধি-বিধানের ব্যাখ্যা প্রদান করেন। এজন্য কোন বিষয়ে ফৎওয়া দেবার পূর্বে মুফতীর জানা আবশ্যক যে, তিনি কোন বিষয়ে ফৎওয়া দিচ্ছেন এবং তা শরী'আত কি-না। কেননা তিনি শরী'আতের (বিধি-বিধানের) ব্যাখ্যাতা। ফলকথা, মানুষ যে বিষয়ে কাউকে দাওয়াত দিবে সে বিষয়ে তাকে জাগ্রত জ্ঞান সম্পন্ন হতে হবে।

দ্বিতীয়ত : আহূত ব্যক্তির অবস্থা সম্পর্কে সজাগ থাকা

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মু'আয (রাঃ)-কে ইয়ামেনে প্রেরণকালে কী বলেছিলেন? তিনি তাকে বলেছিলেন, إِنَّكَ تَأْتِىْ قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ. 'তুমি আহলে কিতাব সম্প্রদায়ের কাছে যাচ্ছ'।[২৩] একথা তিনি মু'আয (রাঃ)-কে এজন্য বলেছিলেন যাতে তিনি তাদের অবস্থা সম্পর্কে অবগত হন এবং তাদের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেন।

আপনি কী এমন ব্যক্তিকে দাওয়াত দিতে যাবেন, যার অবস্থা সম্পর্কে আপনি অবগত নন? হয়ত আহূত ব্যক্তি এমন বাতিল জ্ঞানের অধিকারী যা আপনাকে গোড়াতেই থামিয়ে দিবে। যদিও আপনি হকের উপর থাকেন। সুতরাং আহূত ব্যক্তির অবস্থা সম্পর্কে আপনাকে অবগত হতে হবে যে, তার ইলমী যোগ্যতা কোন পর্যায়ের? আর তার বিতর্কের যোগ্যতাই বা কতটুকু? যাতে আপনি প্রস্তুতি গ্রহণ করে তার সাথে আলোচনা ও বিতর্কে লিপ্ত হতে পারেন। কেননা আপনি যদি এরূপ

[২৩]. বুখারী, হাদীছ নং-১৩৯৫, 'যাকাত' অধ্যায়, 'যাকাত ওয়াজিব হওয়া' অনুচ্ছেদ; মুসলিম, হাদীছ নং-১৯, 'ঈমান' অধ্যায়, 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনার আদেশ দেয়া' অনুচ্ছেদ।

ব্যক্তির সাথে বিতর্কে লিপ্ত হন এবং তার বিতর্ক দক্ষতার কারণে পরিস্থিতি আপনার প্রতিকূলে যায়, তবে তা হকের জন্য বিরাট দুর্যোগ বয়ে আনবে। এজন্য আপনিই দায়ী হবেন। আর কখনোই ধারণা করবেন না যে, বাতিলপন্থী সর্বাবস্থায় ব্যর্থ মনোরথ হবে। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُوْنَ إِلَــىَّ، وَلَعَـــلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَّكُوْنَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِه مِنْ بَعْضٍ، فَأَقْضِىَ لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ مِنْهُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ أَخِيْهِ شَيْئًا فَلاَ يَأْخُذْهُ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِّـــنَ النَّـــارِ. ‘তোমরা আমার নিকট মামলা-মোকদ্দমা নিয়ে আস। আর তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ হয়ত প্রতিপক্ষের তুলনায় সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করার ব্যাপারে অধিক বাকপটু। ফলে আমি তার কাছ থেকে যে যুক্তি-প্রমাণ শুনি তার আলোকে ফায়ছালা প্রদান করি। তবে বাকপটুতার কারণে যার পক্ষে আমি তার ভাইয়ের প্রাপ্য হক ফায়ছালা করে দেই, সে যেন তা গ্রহণ না করে। কেননা তার জন্য আসলে আমি জাহান্নামের অংশ নির্ধারণ করে দেই’।[২৪]

এই হাদীছ প্রমাণ করে যে, বিবাদী যদিও বাতিলপন্থী হয় তবুও সে অন্যের চেয়ে প্রমাণ পেশে সিদ্ধহস্ত হতে পারে। তখন বিবাদীর বক্তব্য অনুযায়ী ফায়ছালা করা হয়। তাই আহূত ব্যক্তির অবস্থা সম্পর্কে আপনাকে অবশ্যই জানতে হবে।

তৃতীয়ত : দাওয়াত দেয়ার পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞাত থাকা

অনেক দাঈ এই বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলেছেন। আপনি তার মধ্যে আগ্রহ, উৎসাহ-উদ্যম, আবেগ বহুল পরিমাণে লক্ষ্য করবেন। কিন্তু তিনি যা বাস্তবায়ন করতে চান সে ব্যাপারে নিজেকে সংবরণ করার ক্ষমতা রাখেন না। ফলে তিনি আল্লাহ্র দিকে হিকমত ছাড়াই আহ্বান করেন। অথচ আল্লাহ তা'আলা বলেন, أُدْعُ إِلَى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِىْ هِىَ أَحْـــسَنُ. ‘তুমি মানুষকে তোমার প্রতিপালকের পথে আহ্বান কর হিকমত ও সদুপদেশ দ্বারা এবং তাদের সাথে তর্ক করবে উত্তম পন্থায়...’ *(নাহল ১২৫)*।

কিন্তু যেই দাঈর অন্তর আল্লাহ তাঁর দ্বীনের প্রতি আগ্রহ দিয়ে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন, তিনি নিজেকে সংবরণ করতে না পেরে অসৎ কর্ম সম্পাদিত হতে দেখে গোশতের উপর পাখির ঝাঁপিয়ে পড়ার ন্যায় ঝাঁপিয়ে পড়েন; তার ও তার মতো হকের পথে

---

[২৪]. বুখারী, হাদীছ নং-২৬৮০, ‘সাক্ষ্য দান’ অধ্যায়, ‘শপথ করার পর বাদী সাক্ষী হাযির করলে’ অনুচ্ছেদ; মুসলিম, হাদীছ নং-১৭১৩, ‘বিচার-ফায়ছালা’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৩।

আহ্বানকারীদের জন্য এখেকে উদ্ভূত পরিণতি নিয়ে মোটেই চিন্তা-ভাবনা করেন না। অথচ আপনারা জানেন যে, হকের শত্রুর সীমা নেই। মহান আল্লাহ বলেন, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِىٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِيْنَ ‘এভাবে আমি অপরাধীদেরকে প্রত্যেক নবীর শত্রু করেছিলাম’ *(ফুরকান ৩১)*।

প্রত্যেক নবীর দাওয়াতের শত্রু ছিল। এজন্য আন্দোলনে প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্বে পরিণতির দিকে দৃকপাত করা এবং পরিস্থিতি পরখ করা দাঈ'র জন্য অত্যাবশ্যক। তার কৃতকর্মের দরুন ঐ মুহূর্তে এমন কিছু ঘটতে পারে, যা হয়ত তার স্পৃহাকে দমিয়ে দিবে। কিন্তু ধীরস্থিরতা ও হিকমত অবলম্বনের মাধ্যমে সেই অসৎ কাজের মূলোৎপাটন করা সম্ভব হতে পারে। অদূর ভবিষ্যতেই হয়ত তা হতে পারে।

তাই আমি দাঈ ভাইদেরকে ধীরস্থিরতা ও হিকমত অবলম্বনের জন্য অনুপ্রাণিত করছি। দাঈরা জানেন যে, মহান আল্লাহ বলেছেন, يُؤْتِى الْحِكْمَةَ مَنْ يَّشَاءُ وَمَـــنْ يُّؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوْتِىَ خَيْرًا كَثِيْرًا. ‘তিনি যাকে ইচ্ছা হিকমত প্রদান করেন এবং যাকে হিকমত প্রদান করা হয় তাকে প্রভূত কল্যাণ দান করা হয়’ *(বাকারাহ ২৬৯)*। ‘তুমি মানুষকে তোমার প্রতিপালকের পথে আহ্বান কর হিকমত ও সদুপদেশ দ্বারা’ *(নাহল ১২৫)*। চাইলে আমরা কল্যাণের শিক্ষক, সর্বশ্রেষ্ঠ ও বিচক্ষণ দাঈ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জীবন থেকে এর অনেক উদাহরণ পেশ করতে পারি।

যদি এটা (দাঈকে কুরআন-সুন্নাহ্র সঠিক জ্ঞান অর্জন করা) কুরআন ও সুন্নাহ্র দলীল সমূহের মর্ম হয়, তাহলে তা স্পষ্ট জ্ঞানেরও মর্ম। এতে কোন সন্দেহ-সংশয় নেই। কারণ আপনি যদি আল্লাহ্র পথে আহ্বানের পদ্ধতি ও শরী'আত সম্পর্কে না জানেন, তাহলে আল্লাহ্র দিকে কীভাবে ডাকবেন? কীভাবে নিজেকে দাঈ হিসাবে দাবী করবেন?

কোন বিষয়ে যদি মানুষ না জানে তবে প্রথমত শিক্ষা গ্রহণ করা অতঃপর দাওয়াত দেওয়া উত্তম। হয়ত কেউ বলতে পারেন, আপনার এ বক্তব্য কী রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বাণী ‘একটি আয়াত হলেও আমার পক্ষ থেকে প্রচার কর’ এর বিরোধী হবে? এর উত্তর হচ্ছে, না। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘আমার পক্ষ থেকে প্রচার কর’। সুতরাং আমরা যা প্রচার করব তা তাঁর মুখনিঃসৃত হতে হবে। আর এটাই আমাদের উদ্দেশ্য। দাঈকে জ্ঞান অর্জন করতে হবে- এ কথার মর্ম এটা নয় যে, তাকে অনেক জ্ঞান অর্জন করতে হবে। তবে আমাদের বক্তব্য হল, দাঈ যতটুকু জানেন সে অনুযায়ীই দাওয়াত দেবেন এবং যা জানেন না, সে বিষয়ে কথা বলবেন না।

তৃতীয় মূলনীতি
কুরআন-সুন্নাহ্‌র সঠিক মর্ম অনুধাবন করা (الفهم)

আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর উদ্দেশ্য অনুধাবন করা এই বরকতময় পুনর্জাগরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ। কেননা অনেক মানুষকে জ্ঞান দেয়া হয়েছে। কিন্তু অনুধাবন ক্ষমতা প্রদান করা হয়নি। না বুঝে শুধু কুরআন মাজীদ ও হাদীছ মুখস্থ করা যথেষ্ট নয়। বরং অবশ্যই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বাণীর মর্মার্থ আপনাকে বুঝতে হবে। ঐ লোকদের দ্বারা কতইনা ক্রুটি-বিচ্যুতি সংঘটিত হয়েছে, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বাণীর মর্ম না বুঝে দলীল পেশ করেছে। ফলে এর মাধ্যমে অনেকেই পথভ্রষ্ট হয়েছে।

এখানে আমি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সতর্ক করব। তা হল- কুরআন-সুন্নাহর মর্ম বুঝতে ভুল-ভ্রান্তি কখনো কখনো অজ্ঞতাবশত ভুল-ভ্রান্তির চেয়ে মারাত্মক ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়ায়। কেননা যে মূর্খ তার মূর্খতার দরুন ভুল করে সে জানে যে, সে মূর্খ এবং জ্ঞান অর্জন করে। কিন্তু যে কুরআন-সুন্নাহ্‌র ভুল মর্ম বুঝে, সে নিজেকে আলেম মনে করে এবং বিশ্বাস করে যে, সে যা বুঝেছে তা-ই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উদ্দেশ্য।

কুরআন-সুন্নাহ্‌র মর্ম অনুধাবনের গুরুত্ব ফুটিয়ে তোলার জন্য আমরা কতিপয় উদাহরণ পেশ করছি :

প্রথম উদাহরণ : মহান আল্লাহ বলেন, وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِى الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيْهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِيْنَ- فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلاًّ آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَ سَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَ الطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِيْنَ. 'এবং স্মরণ কর দাঊদ ও সুলায়মানের কথা, যখন তারা বিচার করছিলেন শস্যক্ষেত্র সম্পর্কে; তাতে রাত্রিকালে প্রবেশ করেছিল কোন সম্প্রদায়ের মেষ; আমি প্রত্যক্ষ করছিলাম তাদের বিচার। অতঃপর আমি সুলায়মানকে এ বিষয়ের মীমাংসা বুঝিয়ে দিয়েছিলাম এবং তাদের প্রত্যেককে আমি দিয়েছিলাম প্রজ্ঞা ও জ্ঞান। আমি পর্বত ও বিহঙ্গকুলকে

অধীন করে দিয়েছিলাম- তারা দাঊদের সঙ্গে আমার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করত। আমিই ছিলাম এই সমস্তের কর্তা' *(আম্বিয়া ৭৮-৭৯)*।[২৫]

এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা অনুধাবন ক্ষমতার দ্বারা দাঊদ (আঃ)-এর উপর সুলায়মান (আঃ)-কে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছিলেন। আল্লাহ বলেন, 'আমি সুলায়মানকে এ বিষয়ের মীমাংসা বুঝিয়ে দিয়েছিলাম'। কিন্তু এক্ষেত্রে দাঊদ (আঃ)-এর জ্ঞানের কোন ঘাটতি ছিল না। আল্লাহ বলেন, 'এবং তাদের প্রত্যেককে আমি প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দান করেছিলাম'।

উল্লিখিত আয়াতে কারীমার দিকে লক্ষ্য করুন! আল্লাহ তা'আলা যখন সুলায়মান (আঃ) যে অনুধাবন ক্ষমতার বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত তা উল্লেখ করেছেন, তখন তিনি দাঊদ (আঃ)-এর বৈশিষ্ট্যও উল্লেখ করেছেন। যেমন আল্লাহ বলেন, 'আমি পর্বত ও বিহঙ্গকুলকে অধীন করে দিয়েছিলাম- তারা দাঊদের সঙ্গে আমার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করত'। যাতে তাদের উভয়েই সমান হন। এজন্য তারা উভয়েই প্রজ্ঞা ও জ্ঞানের যে গুণে বিভূষিত আল্লাহ তা'আলা তা উল্লেখ করত তাদের প্রত্যেকের পৃথক বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন। এটা আমাদেরকে অনুধাবনের গুরুত্ব নির্দেশ করে এবং এও নির্দেশ করে যে, জ্ঞানই সবকিছু নয়।

দ্বিতীয় উদাহরণ : যদি আপনার নিকট শীতকালে দু'টি পাত্র থাকে, যার একটিতে রয়েছে গরম পানি, আর অন্যটিতে রয়েছে কনকনে ঠাণ্ডা পানি। এমতাবস্থায় একজন

---

[২৫]. ইমাম বাগাভী আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস, কাতাদাহ ও যুহরী থেকে বর্ণনা করেন যে, একদা দু'জন লোক হযরত দাঊদের নিকটে একটি বিষয়ে মীমাংসার জন্য আসে। তাদের একজন ছিল ছাগপালের মালিক এবং অন্যজন ছিল শস্য ক্ষেতের মালিক। শস্যক্ষেতের মালিক ছাগপালের মালিকের নিকট দাবী পেশ করল যে, তার ছাগপাল রাত্রিকালে আমার শস্যক্ষেতে চড়াও হয়ে সম্পূর্ণ ফসল বিনষ্ট করে দিয়েছে। আমি এর প্রতিকার চাই। সম্ভবত শস্যের মূল্য ও ছাগলের মূল্যের হিসাব সমান বিবেচনা করে হযরত দাঊদ (আঃ) শস্যক্ষেতের মালিককে তার বিনষ্ট ফসলের বিনিময় মূল্য হিসেবে পুরা ছাগপাল শস্যক্ষেতের মালিককে দিয়ে দিতে বললেন। বাদী ও বিবাদী উভয়ে বাদশাহ দাঊদ-এর আদালত থেকে বেরিয়ে আসার সময় দরজার মুখে পুত্র সুলায়মানের সাথে দেখা হয়। তিনি মোকদ্দমার রায় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তারা সব খুলে বলল। তিনি পিতা দাঊদের কাছে গিয়ে বললেন, আমি রায় দিলে তা ভিন্নরূপ হত এবং উভয়ের জন্য কল্যাণকর হত। অতঃপর পিতার নির্দেশে তিনি বললেন, ছাগপাল শস্যক্ষেতের মালিককে সাময়িকভাবে দিয়ে দেওয়া হউক। সে এগুলোর দুধ, পশম ইত্যাদি দ্বারা উপকার লাভ করুক। পক্ষান্তরে শস্যক্ষেতটি ছাগপালের মালিককে অর্পণ করা হউক। সে তাতে শস্য উৎপাদন করুক। অতঃপর শস্যক্ষেত্র যখন ছাগপালে বিনষ্ট করার পূর্বের অবস্থায় পৌঁছে যাবে, তখন তা ক্ষেতের মালিককে ফিরিয়ে দেওয়া হবে এবং ছাগপাল তার মালিককে ফেরৎ দেওয়া হবে। দাঊদ (আঃ) রায়টি অধিক উত্তম গণ্য করে সেটাকেই কার্যকর করার নির্দেশ দেন (তাফসীরে ইবনে কাছীর ৫/৩৬৫; মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, নবীদের কাহিনী ২/১৩০-১৩১) -অনুবাদক।

লোক এসে অপবিত্রতা থেকে পবিত্র হওয়ার জন্য গোসল করতে চাইল। তখন কেউ বলল, ঠাণ্ডা পানি ব্যবহার করাই উত্তম। কারণ (শীতকালে) ঠাণ্ডা পানি ব্যবহার করা কষ্টকর। তাছাড়া নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, أَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟ قَالُوْا : بَلَى يَا رَسُوْلَ اللهِ. قَالَ : إِسْبَاغُ الْوُضُوْءِ عَلَى الْمَكَارِهِ ... ‘আমি কী তোমাদের বলে দেব না যে, আল্লাহ কিসের দ্বারা (মানুষের) গোনাহ মুছে দেন এবং (তার) মর্যাদাকে বৃদ্ধি করেন’? ছাহাবায়ে কেরাম বললেন, হ্যাঁ, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, ‘কষ্ট সত্ত্বেও পূর্ণরূপে ওযূ করা...’।[২৬] অর্থাৎ শীতকালে পূর্ণরূপে ওযূ করা। সুতরাং ঠাণ্ডা পানি দ্বারা ওযূ করা শীতকালের আবহাওয়ার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ গরম পানি দ্বারা ওযূ করার চেয়ে উত্তম। উক্ত ব্যক্তি ফৎওয়া দিল যে, শীতকালে ঠাণ্ডা পানি ব্যবহার করা উত্তম এবং উল্লিখিত হাদীছ দ্বারা দলীল পেশ করল। তাহলে তার ভুল কী জ্ঞানের ক্ষেত্রে, না হাদীছের সঠিক মর্ম অনুধাবনের ক্ষেত্রে? নিঃসন্দেহে তার ভুল অনুধাবনের ক্ষেত্রে। কারণ রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘কষ্ট সত্ত্বেও পূর্ণরূপে ওযূ করা’। কিন্তু তিনি ওযূর জন্য ঠাণ্ডা পানি বেছে নিতে বলেননি। এ দু’টি ব্যাখ্যার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। যদি হাদীছে বর্ণিত মর্ম দ্বিতীয় ব্যাখ্যাকে অর্থাৎ শীতকালে ঠাণ্ডা পানি দ্বারা ওযূ করা বুঝাত তাহলে আমরা বলতাম, ঠাণ্ডা পানি বেছে নাও। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘কষ্ট সত্ত্বেও পূর্ণরূপে ওযূ করা’। অর্থাৎ পূর্ণরূপে ওযূ করতে ঠাণ্ডা পানিও মানুষকে বাধা দিবে না।

অতঃপর আমাদের বক্তব্য হল, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য সহজ চান, না কাঠিন্য চান? এর উত্তর রয়েছে মহান আল্লাহ্‌র বাণী يُرِيْدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ. ‘আল্লাহ তোমাদের জন্য যা সহজ তা চান এবং যা তোমাদের জন্য কষ্টকর তা চান না’ *(বাকারাহ ১৮৫)* এবং রাসূল (ছাঃ)-এর বাণী- إِنَّ الدِّيْنَ يُسْرٌ ‘নিশ্চয়ই দ্বীন সহজ’[২৭]-এর মধ্যে।

তাই জাগরণ প্রত্যাশী যুবকদের বলব, কুরআন-হাদীছের সঠিক মর্ম অনুধাবন করা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আল্লাহ তাঁর বান্দাদের কাছে কী চেয়েছেন? তা আমাদের বুঝা উচিত। তিনি কী ইবাদত পালনের ক্ষেত্রে তাদের উপর কাঠিন্য চাপিয়ে দিতে চান, নাকি তাদের জন্য সহজ চান? নিঃসন্দেহে আল্লাহ আমাদের জন্য সহজ চান, কঠিন নয়।

[২৬]. মুসলিম, হাদীছ নং-২৫১, ‘পবিত্রতা’ অধ্যায়, ‘কষ্ট সত্ত্বেও পূর্ণরূপে ওযূ করার ফযীলত’ অনুচ্ছেদ।
[২৭]. বুখারী, হাদীছ নং-৩৯, ‘ঈমান’ অধ্যায়, ‘দ্বীন সহজ’ অনুচ্ছেদ।

চতুর্থ মূলনীতি

প্রজ্ঞা (الحكمة)

আল্লাহ্‌র পথে দাওয়াত দানের ক্ষেত্রে প্রজ্ঞাও একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিশেষ করে ইসলামী পুনর্জাগরণ প্রত্যাশী যুবকদের জন্য। আর প্রজ্ঞাহীন ব্যক্তির কাছে প্রজ্ঞা কতইনা তিক্ত বিষয়!

আল্লাহ্‌র পথে দাওয়াতের চারটি স্তর :

প্রথমত : হিকমত দ্বারা।

দ্বিতীয়ত : সদুপদেশ দ্বারা।

তৃতীয়ত : অত্যাচারী ব্যতীত অন্যদের সাথে উত্তম পন্থায় বিতর্কের দ্বারা।

চতুর্থত : অত্যাচারীকে বাধাদানের দ্বারা।

এই চারটি স্তরের দলীল হচ্ছে আল্লাহ্‌র বাণী : أُدْعُ إِلَى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ هِيَ أَحْسَنُ. ‘তুমি মানুষকে তোমার প্রতিপালকের পথে আহ্বান কর হিকমত ও সদুপদেশ দ্বারা এবং তাদের সাথে বিতর্ক করবে উত্তম পন্থায়’ *(নাহল ১২৫)* এবং وَلاَ تُجَادِلُوْا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلاَّ بِالَّتِيْ هِيَ أَحْسَنُ إِلاَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ. ‘তোমরা উত্তম পন্থা ব্যতীত আহলে কিতাবের সাথে বিতর্ক করবে না, তবে তাদের সাথে নয়, যারা তাদের মধ্যে সীমালংঘনকারী’ *(আনকাবূত ৪৬)*।[২৮]

[২৮]. উল্লিখিত আয়াতে সীমালংঘনকারী বা যালেম বলতে কাদেরকে বুঝানো হয়েছে সে সম্পর্কে তাবেঈ বিদ্বান মুজাহিদ ও সাঈদ বিন জুবাইর (রহঃ) বলেন, وقوله : (إِلاَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ) معناه: إلا الذين نصبوا للمؤمنين الحرب فجدالهم بالسيف حتى يؤمنوا، أو يعطوا الجزية. ‘তবে তাদের সাথে নয়, যারা তাদের মধ্যে যালেম বা সীমালংঘনকারী’ আয়াতাংশের অর্থ হচ্ছে- ‘আহলে কিতাবের (ইহুদী-খৃষ্টান) মধ্যে যারা মুমিনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ইন্ধন যুগিয়েছে তারা ঈমান না আনা বা জিযিয়া প্রদান না করা পর্যন্ত তাদের সাথে তরবারি দ্বারা যুদ্ধ করতে হবে’ (তাফসীরে কুরতুবী (বৈরূত : দারুল কুতুব আল-ইলমিইয়াহ, ১৪১৩ হিঃ/১৯৯৩ খৃঃ), ১৩ খণ্ড, পৃঃ ২৩২)। ইমাম বাগাবীও অনুরূপ বলেছেন (দ্রঃ মুখতাছার তাফসীরুল বাগাবী, সংক্ষিপ্তকরণে : ড. আব্দুল্লাহ বিন আহমাদ বিন আলী যায়েদ (রিয়াদ : দারুস সালাম, ১৪২২ হিঃ), পৃ. ৭২৬)। জগদ্বিখ্যাত মুফাসসির হাফেয ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, أى : حادوا عن وجه الحق،

কোন বিষয়কে যথাযথ স্থানে প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে সুনিপুণ ও সুন্দরভাবে তা সম্পাদন করাই হচ্ছে হিকমত। মানুষ বর্তমানে যে অবস্থায় রয়েছে তাথেকে রাতারাতি ছাহাবায়ে কেরামের অবস্থায় ফিরে আসার কল্পনা করা এবং এক্ষেত্রে দ্রুততা অবলম্বন করা হিকমত নয়। যে এরূপ কল্পনা করবে সে গণ্ডমূর্খ ও হিকমত অবলম্বন থেকে অনেক দূরে অবস্থানকারী। কেননা এটি আল্লাহ্‌র হিকমতেরও পরিপন্থী। এর প্রমাণ হচ্ছে- যে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উপর কুরআন মাজীদ অবতীর্ণ হয়েছিল তাঁর উপর শরী'আতের বিধি-বিধান ধীরে ধীরে অবতীর্ণ হয়েছিল, যাতে মানুষের মনে তা প্রোথিত-গ্রথিত হয় ও পরিপূর্ণতা লাভ করে।

হিজরতের তিন মতান্তরে দেড় বা পাঁচ বছর পূর্বে মি'রাজের রজনীতে ছালাত ফরয হয়। তবে বর্তমান রূপে তা ফরয হয়নি। প্রথমত যোহর, আছর, এশা ও ফজরের ছালাত দু'রাক'আত ফরয করা হয়েছিল।[২৯] আর মাগরিবের ছালাত তিন রাক'আতই ছিল, যাতে তা দিনের বিতর বা বেজোড় ছালাত হয়। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মক্কায় তের বছর অতিবাহিত করার পর হিজরতের পরে মুকীমের ছালাতের রাক'আত সংখ্যা বৃদ্ধি করে যোহর, আছর ও এশার ছালাত চার রাক'আত নির্ধারণ করেন। আর ফজরের ছালাত পূর্বের ন্যায় (দু'রাক'আত) বহাল থাকে। কারণ ফজরের ছালাতে কিরাআত দীর্ঘ হয়। অন্যদিকে মাগরিবের ছালাত তিন রাক'আতই থেকে যায়। কেননা তা দিনের বিতর বা বেজোড় ছালাত।

যাকাত দ্বিতীয় হিজরীতে অথবা মক্কায় ফরয হয়েছিল। কিন্তু তখনও উহার নিছাব ও কতটুকু প্রদান করলে ওয়াজিব আদায় হবে তার পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়নি এবং ৯ম হিজরীর পূর্বে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যাকাত আদায়কারীদেরকে যাকাত আদায়ের জন্য লোকদের কাছে প্রেরণও করেননি। যাকাতের বিকাশ ঘটে তিনটি স্তরে :

প্রথম স্তর : মক্কায়। মহান আল্লাহ বলেন, وَآتُوْا حَقَّهُ يَــوْمَ حَــصَادِه 'আর ফসল কাটার দিনে উহার হক প্রদান করবে' *(আন'আম ১৪১)*। কিন্তু তখন কতটুকু যাকাত দিলে ওয়াজিব আদায় হবে এবং কী পরিমাণ সম্পদ হলে তাতে যাকাত ওয়াজিব হবে তা বর্ণনা করা হয়নি; বরং বিষয়টি মানুষের ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেয়া হয়েছিল।

দ্বিতীয় স্তর : দ্বিতীয় হিজরীতে যাকাতের নিছাব বর্ণনা করা হয়।

وعموا عن واضح المحجة، وعاندوا وكابروا، فحينئذ ينتقل من الجدال إلى الجلاد. 'অর্থাৎ সীমালংঘনকারী তারাই যারা হক পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে, স্পষ্ট পথের দিশা পায়নি এবং জেনে-বুঝে হকের বিরোধিতা করেছে। এদের সাথে বিতর্কের পরিবর্তে যুদ্ধ করতে হবে' (তাফসীর ইবনে কাছীর, তাহকীক : ড. সাইয়েদ মুহাম্মাদ সাইয়েদ ও অন্যান্য (কায়রো : দারুল হাদীছ, ১৪২৩ হিঃ/২০০২ খৃঃ), ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২৯৯)। -অনুবাদক

[২৯]. বুখারী, হাদীছ নং-৩৫০, 'ছালাত' অধ্যায়, 'মি'রাজের রজনীতে কিভাবে ছালাত ফরয করা হয়েছিল' অনুচ্ছেদ, হাদীছ নং-৩৯৩৫, 'আনছারদের মর্যাদা' অধ্যায়।

তৃতীয় স্তর : ৯ম হিজরীতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) গবাদিপশু ও ফলের মালিকদের কাছ থেকে যাকাত গ্রহণের জন্য আদায়কারীদেরকে পাঠাতে শুরু করেন।

শরী'আতের বিধি-বিধান মানুষদের জন্য প্রবর্তিত হওয়ার ক্ষেত্রে তাদের অবস্থার দিকে আল্লাহ্‌র লক্ষ্য রাখার বিষয়টি চিন্তা করুন! তিনি বিচারকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিচারক।

অনুরূপভাবে আমাদের কাছে সুস্পষ্ট যে, ছিয়ামও পর্যায়ক্রমে ফরয করা হয়েছিল। আল্লাহ তা'আলা প্রথম ছিয়াম ফরয করার সময় মানুষদেরকে ছিয়াম পালন করা বা খাদ্য খাওয়ানোর যেকোন একটি বেছে নেয়ার অবকাশ দিয়েছিলেন। অতঃপর ছিয়াম পালন ফরয হয় এবং যে ধারাবাহিকভাবে ছিয়াম পালনে অক্ষম তার জন্য খাদ্য খাওয়ানো নির্ধারিত হয়।

আমার বক্তব্য হল, **রাতারাতি বিশ্ব পরিবর্তন হওয়া হিকমতের পরিপন্থী। এর জন্য অবশ্যই দীর্ঘ সময় প্রয়োজন**। যে ভাইকে আপনি আহ্বান করবেন তিনি যতটুকু হকের উপর আছেন সে বিষয়ে মনোযোগ দিন এবং তাকে ভ্রান্ত পথ থেকে মুক্ত না করা পর্যন্ত তার সাথে ধীরস্থিরতার নীতি অবলম্বন করুন। আপনার নিকট সব মানুষ এক সমান হবে না। মূর্খ ও হঠকারীর মধ্যে অবশ্যই পার্থক্য রয়েছে।

আল্লাহ্‌র পথে দাওয়াত দেয়ার ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হিকমত অবলম্বনের কতিপয় দৃষ্টান্ত এখানে পেশ করা সংগত মনে করছি। যেমন-

প্রথম দৃষ্টান্ত : যে বেদুঈন মসজিদে পেশাব করেছিল তার সাথে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আচরণ :

আনাস বিন মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আমরা মসজিদে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে বসেছিলাম। ইতিমধ্যে এক বেদুঈন এসে দাঁড়িয়ে মসজিদে পেশাব করতে লাগল। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণ বলতে লাগলেন, থাম, থাম। বর্ণনাকারী বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, لاَ تُزْرِمُوْهُ دَعُــوْهُ 'তোমরা ওকে বাধা দিও না, ওকে ছেড়ে দাও'। অতঃপর তারা তাকে ছেড়ে দিলেন, সে পেশাব করা শেষ করল। তারপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে ডেকে বললেন,

إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لاَ تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا الْبَوْلِ، وَلاَ الْقَذَرِ، إِنَّمَا هِيَ لِــذِكْرِ اللهِ، وَالصَّلاَةِ، وَقِرَاءَ ةِ الْقُرْآنِ.

'দেখ, এই মসজিদ সমূহে পেশাব করা বা একে কোন রকম নাপাক করা সঙ্গত নয়। এসবতো শুধু আল্লাহ্‌র যিকর করা, ছালাত আদায় করা ও কুরআন তেলাওয়াত করার জন্য'। অথবা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এই ধরনের কিছু বলেছিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) লোকদের মধ্যে একজনকে নির্দেশ দিলে সে এক বালতি পানি নিয়ে এল। তিনি তা পেশাবের উপর ঢেলে দিলেন।[৩০]

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একবার ছালাতে দাঁড়ান। আমরাও তাঁর সাথে দাঁড়িয়ে গেলাম। এ সময় এক বেদুঈন ছালাত আদায়রত অবস্থায় বলে উঠল, 'হে আল্লাহ! আমার ও মুহাম্মাদের উপর রহম কর এবং আমাদের সাথে আর কারো প্রতি রহম কর না'। সালাম ফিরিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বেদুঈনকে বললেন, لَقَدْ حَجَّرْتَ وَاسِعًا 'তুমি একটি প্রশস্ত জিনিসকে অর্থাৎ আল্লাহ্‌র রহমতকে সংকুচিত করেছ'।[৩১]

আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা এক বেদুঈন মসজিদে প্রবেশ করে ছালাত আদায় করে। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বসাছিলেন। অতঃপর সে ছালাত আদায় করে বলল, 'হে আল্লাহ! আমার এবং মুহাম্মাদের উপর রহম কর এবং আমাদের সাথে আর কারো প্রতি রহম কর না'। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার দিকে তাকিয়ে বললেন, لَقَدْ تَحَجَّرْتَ وَاسِعًا 'তুমি একটি প্রশস্ত জিনিসকে (আল্লাহ্‌র রহমত) সংকুচিত করেছ'। কিছুক্ষণ পর সে মসজিদে পেশাব করে দিলে লোকেরা তার দিকে ছুটে গেল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তখন বললেন, أَهْرِيْقُوْا عَلَيْهِ سَجْلاً مِنْ مَاءٍ أَوْ دَلْوًا مِنْ مَاءٍ. 'তার পেশাবের উপর এক বালতি পানি ঢেলে দাও'। অতঃপর বললেন, إِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِيْنَ، وَلَمْ تُبْعَثُوْا مُعَسِّرِيْنَ 'তোমাদের সহজ ও বিনম্র আচরণ করার জন্য পাঠানো হয়েছে, কঠোর আচরণ করার জন্য পাঠানো হয়নি'।[৩২]

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, বেদুঈন তার অশোভন কাজের কথা বুঝতে পেরে বলল, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমার দিকে এগিয়ে এলেন। তার জন্য

[৩০]. মুসলিম, হাদীছ নং-২৮৫, 'পবিত্রতা' অধ্যায়, 'মসজিদে পেশাব এবং অন্যান্য নাপাকী পড়লে তা ধুয়ে ফেলা যরূরী' অনুচ্ছেদ।

[৩১]. বুখারী, হাদীছ নং-৬০১০, 'শিষ্টাচার' অধ্যায়, 'মানুষ ও পশুর প্রতি দয়া' অনুচ্ছেদ।

[৩২]. মুসনাদে আহমাদ ২/২৩৯ পৃঃ; আবূ দাঊদ, হাদীছ নং-৩৮০, 'পবিত্রতা' অধ্যায়, 'মাটিতে পেশাব লাগলে তার বিধান' অনুচ্ছেদ; তিরমিযী, হাদীছ নং-১৪৭, 'পবিত্রতা' অধ্যায়, 'মাটিতে পেশাব লাগলে তার বিধান' অনুচ্ছেদ, হাদীছটি ছহীহ।

আমার পিতা-মাতা কুরবান হোক। তিনি আমাকে গালি দিলেন না, ধমক দিলেন না, প্রহারও করলেন না।[৩৩]

উল্লিখিত বর্ণনাগুলো উদ্ধৃত করার পর এই বেদুঈনের সাথে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যে হিকমত অবলম্বন করেছিলেন সে ব্যাপারে আমরা কী বলব? আমার ধারণা বর্তমানে যদি কেউ কোন মসজিদে এসে পেশাব করা শুরু করে তাহলে লোকেরা পৃথক পৃথকভাবে কিংবা একসঙ্গে অগ্রসর হয়ে বলবে, 'তোমার কী লজ্জা-শরম নেই? আল্লাহকে ভয় কর' ... ইত্যাদি। এটা ভুল।

আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী কোন মুমিন অজ্ঞতা ছাড়া মসজিদে দাঁড়িয়ে পেশাব করতে পারে না। অজ্ঞতা তার জন্য ওযর স্বরূপ। নিঃসন্দেহে বেদুঈন মূর্খ ছিল। কেননা সে মরুভূমি থেকে এসেছিল এবং মসজিদকে সম্মান করা যে আবশ্যক তা তার জানা ছিল না। কিন্তু হিকমত অবলম্বনের কারণে ঐ বেদুঈন শিক্ষা লাভ করেছিল এবং মসজিদের প্রতি কী কর্তব্য তা বুঝেছিল। ছাহাবায়ে কেরামের হুমকি-ধমকি অনুযায়ী যদি ঐ বেদুঈন পেশাব করা বন্ধ করত তাহলে এর ফল কী হত? এর ফল হত ১. তার পেশাব করাতে ছেদ পড়ত। পেশাব আটকিয়ে রাখার কারণে হয়ত সে স্বাস্থ্যগত দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হত। ২. তার কাপড় নোংরা হত। আর যদি সে পেশাব করার সময় তার কাপড় উঠিয়ে থাকত, তাহলে তার লজ্জাস্থান প্রকাশ পেত। এতে মসজিদও হয়ত বেশি নোংরা হত। হে আল্লাহ্‌র পথে আহ্বানকারী! হিকমত ও তার উত্তম ফলাফল নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করুন!

দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত : মু'আবিয়া ইবনুল হাকাম আস-সুলামী (রাঃ)-এর সাথে রাসূল (ছাঃ)-এর আচরণ

মু'আবিয়া ইবনুল হাকাম আস-সুলামী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে ছালাত আদায় করছিলাম। ইত্যবসরে আমাদের মধ্যে একজন হাঁচি দিল। আমি বললাম, 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' (আল্লাহ তোমার উপর রহম করুন!) তখন লোকেরা আমার দিকে আড় চোখে দেখতে লাগল। আমি বললাম, আমার মায়ের পুত্র বিয়োগ হোক। তোমরা আমার দিকে এভাবে দেখছ কেন? তখন তারা তাদের উরুর উপর হাত চাপড়াতে লাগল। আমি যখন বুঝতে পারলাম যে, তারা আমাকে চুপ করাতে চাচ্ছে, তখন আমি চুপ হয়ে গেলাম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছালাত শেষ করলেন, তাঁর জন্য আমার পিতা-মাতা কুরবান হোক! আমি তাঁর মত এত সুন্দর করে শিক্ষা দিতে পূর্বেও কাউকে দেখিনি, পরেও কাউকে দেখিনি।

[৩৩]. মুসনাদে আহমাদ ২/৫০৩ পৃঃ; ইবনু মাজাহ, হাদীছ নং-৫২৯, 'পবিত্রতা' অধ্যায়, 'পেশাবসিক্ত যমীনকে কিভাবে পবিত্র করতে হবে' অনুচ্ছেদ, হাদীছটি হাসান ছহীহ।

আল্লাহ্‌র কসম! তিনি আমাকে ধমক দিলেন না, মারলেন না, গালিও দিলেন না; বরং বললেন, إِنَّ هَذِهِ الصَّلاَةَ لاَ يَصْلُحُ فِيْهَا شَيْءٌ مِنْ كَلاَمِ النَّاسِ، إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيْحُ وَالتَّكْبِيْرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ. ‘ছালাতে কথা-বার্তা বলা ঠিক নয়। বরং তা হচ্ছে- তাসবীহ, তাকবীর ও কুরআন পাঠের জন্য’।[৩৪] অথবা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অনুরূপ কিছু বলেছিলেন।

এই হাদীছ থেকে আমরা একটি ফিকহী মাসআলা গ্রহণ করতে পারি। তা হল- যদি কোন মানুষ অজ্ঞতাবশত বা ভুলবশত ছালাতে কথা বলে, তাহলে তার ছালাত শুদ্ধ হয়ে যাবে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, এক ব্যক্তি ছালাত আদায় করছে। এমতাবস্থায় অন্য আরেকজন এসে তাকে বলল, ‘বাড়ির চাবি কোথায়? আমি এখান থেকে বের হতে চাচ্ছি’। তখন সে ছালাত আদায়রত অবস্থায় ভুলবশত বলল, ‘ঘরের জানালায় চাবি আছে’। তার ছালাত কি বাতিল হবে, না হবে না? এর উত্তর হল, যদি সে ভুলবশত এরূপ বলে থাকে তাহলে তার ছালাত আদায় হয়ে যাবে। মহান আল্লাহ বলেন, رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَّسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا ‘হে আমাদের প্রতিপালক যদি আমরা বিস্মৃত হই অথবা ভুল করি তবে তুমি আমাদেরকে পাকড়াও করো না’ *(বাকারাহ ২৮৬)*।

সতর্কীকরণ :

প্রথম ও দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত থেকে আমরা দু’টি বিষয় সম্পর্কে অবগত হতে পারি।

প্রথম বিষয় : মূর্খ ব্যক্তির সাথে নম্রতা অবলম্বন করা। কারণ মূর্খ ব্যক্তি মা‘যূর। যদি আপনি তাকে শিক্ষা দেন তাহলে সে হঠকারীর ন্যায় হঠকারিতা প্রদর্শন না করে শিক্ষাগ্রহণ করবে।

দ্বিতীয় বিষয় : কোন মানুষ অপবিত্র হলে দ্রুত অপবিত্রতা দূর করার ব্যবস্থা করবে। কেননা বেদুঈন পেশাব করা শেষ করা মাত্রই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এক বালতি পানি নিয়ে আসার হুকুম দিলেন। আর বিলম্ব না করে সেই পানি তার উপর ঢেলে দেয়া হল।

অনুরূপভাবে যদি আপনার কাপড়, শরীর বা ছালাত আদায়ের স্থানে অপবিত্রতা লেগে যায়, তাহলে দ্রুত তা পবিত্র করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। কারণ হয়ত আপনি ভুলে গিয়ে অপবিত্র কাপড়, অপবিত্র শরীর বা অপবিত্র স্থানে ছালাত আদায় করতে পারেন। এর দৃষ্টান্ত হচ্ছে- একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে একটি

[৩৪]. মুসলিম, হাদীছ নং-৫৩৭, ‘মসজিদ ও ছালাতের স্থান’ অধ্যায়, ‘ছালাতে কথা বলা নিষেধ’ অনুচ্ছেদ।

শিশুকে[৩৫] নিয়ে এসে তার কোলে রাখা হল। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কোমল হৃদয়ের অধিকারী ও দয়ালু ছিলেন। শিশুটিকে তাঁর কোলে রাখা মাত্রই সে পেশাব করে দিল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পানি আনালেন এবং এর উপর ঢেলে দিলেন (فَدَعَا بِمَاءٍ فَأَتْبَعَهُ إِيَّاهُ)।[৩৬] এখানে (فَدَعَا) ‘ফা’ বর্ণটি ধারাবাহিকতা ও পরপর বুঝিয়েছে। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, অপবিত্র ও কষ্টদায়ক বস্তু দ্রুত দূর করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা আপনার কর্তব্য।

তৃতীয় দৃষ্টান্ত : যে ব্যক্তি স্বর্ণের আংটি পরিধান করেছিল তার সাথে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আচরণ

আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এক ব্যক্তির হাতে একটি স্বর্ণের আংটি দেখতে পেয়ে সেটি খুলে ফেলে দিলেন এবং বললেন, يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِّنْ نَّارٍ فَيَجْعَلُهَا فِيْ يَدِه. ‘তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ আগুনের টুকরা সংগ্রহ করে তার হাতে রাখে’? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রস্থান করলে লোকটিকে বলা হল, তোমার আংটিটি তুলে নিয়ে এর দ্বারা উপকৃত হও। সে বলল, না। আল্লাহ্‌র শপথ! আমি কখনো ওটা নেব না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তো ওটা ফেলে দিয়েছেন।[৩৭]

পাপীর সাথে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কিরূপ আচরণ করেছেন তা আমাদের লক্ষ্য করা উচিত। এই ব্যক্তির সাথে বেদুঈন ও মু‘আবিয়া ইবনুল হাকাম (রাঃ)-এর ঘটনা তুলনা করলে বিস্তর পার্থক্য দেখতে পাবেন। এই ঘটনায় কিছুটা কঠোরতা অবলম্বন করা হয়েছে। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজেই স্বর্ণের আংটিটি খুলে ফেলেছিলেন এবং ঐ ব্যক্তিকে এ মর্মে ভীতিপ্রদর্শন করেছিলেন যে, সে তার হাতে যে আংটি পরিধান করেছে তা আগুনের টুকরা।

[৩৫]. হাফেয ইবনু হাজার আসকালানী (রহঃ) বলেন, يظهر لى أن المراد به ابن أم قيس المذكور بعده، ويحتمل أن يكون الحسن بن على أو الحسين ‘শিশু দ্বারা পরবর্তী হাদীছে (বুখারী, হাদীছ নং-২২৩) উল্লিখিত উম্মে কায়সের ছেলে উদ্দেশ্য বলে আমার কাছে প্রতীয়মান হয়। তবে আলী (রাঃ)-এর ছেলে হাসান বা হুসাইন (রাঃ)ও উদ্দেশ্য হতে পারে’। এর প্রমাণে তিনি তাবারানী কর্তৃক ‘আল-মু‘জাম আল-আওসাত’ গ্রন্থে উম্মে সালমা থেকে হাসান সনদে বর্ণিত একটি হাদীছসহ অন্যান্য হাদীছ উল্লেখ করেছেন। উল্লেখ্য, উকাশা বিন মিহছান আল-আসাদী (রাঃ)-এর বোন উম্মে কায়স প্রথম হিজরতকারিণীদের অন্যতম ছিলেন (ফাতহুল বারী (রিয়াদ : দারুস সালাম, ১ম প্রকাশ ১৪২১ হিঃ/ ২০০০ খৃঃ), ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪২৫।-অনুবাদক

[৩৬]. বুখারী, হাদীছ নং-২২২, ‘ওযূ’ অধ্যায়, ‘শিশুদের পেশাব’ অনুচ্ছেদ।

[৩৭]. মুসলিম, হাদীছ নং-২০৯০, ‘পোশাক ও সাজসজ্জা’ অধ্যায়, ‘স্বর্ণের আংটি খুলে ফেলা’ অনুচ্ছেদ।

চতুর্থ দৃষ্টান্ত : বারীরার মনিবের সাথে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আচরণ

উরওয়া থেকে বর্ণিত, আয়েশা (রাঃ) তাকে বর্ণনা করেন, বারীরা (রাঃ) একবার দাসত্ব থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য অর্থ পরিশোধের ব্যাপারে তাঁর কাছে সাহায্য চাইতে আসলেন। তখন পর্যন্ত বারীরা সেই অর্থ থেকে কিছুই আদায় করেননি। আয়েশা (রাঃ) তাকে বললেন, তুমি তোমার মালিকের কাছে ফিরে যাও। তারা সম্মত হলে আমি তোমার মুকাতাবাতের[৩৮] প্রাপ্য পরিশোধ করে দিব। আর তোমার 'ওয়ালার'[৩৯] অধিকার আমার হবে। অতঃপর আয়েশা (রাঃ) বিষয়টি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে পেশ করলেন। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, রাসূল (ছাঃ) বিষয়টি শুনে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন। আমি ঘটনাটি তাঁকে খুলে বললাম। তখন তিনি বললেন, خُذِيْهَا فَأَعْتِقِيْهَا وَاشْتَرِطِىْ لَهُمُ الْوَلاَءَ، فَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ 'তাকে নিয়ে যাও এবং আযাদ করে দাও। ওয়ালা তাদের হবে, এ শর্ত মেনে নাও, (এতে কিছু আসে যায় না)। কেননা যে আযাদ করবে, ওয়ালা তারই হবে'। আয়েশা (রাঃ) বলেন, এরপর

---

৩৮. 'আল-মুকাতাবাহ' বা 'আল-কিতাবাহ'-এর সংগা প্রদান করতে গিয়ে ইমাম রাগেব ইস্পাহানী বলেন, وكتابة العبد ابتياع نفسه من سيده بما يؤديه من كسبه 'মনিবকে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদানের বিনিময়ে দাস বা দাসীর মুক্ত হওয়ার চুক্তিকে কিতাবাহ বা মুকাতাবাহ বলা হয়' (রাগেব ইস্পাহানী, আল-মুফরাদাতু ফী গারীবিল কুরআন, পৃঃ ৪২৭)। আর যে এরূপ চুক্তি করে তাকে বলা হয় 'মুকাতাব' (দ্রঃ ফাতহুল বারী ৫/২২৭ পৃঃ; মুফতী আমীমুল ইহসান, কাওয়াইদুল ফিক্বহ (দেওবন্দ : আশরাফী বুক ডিপো, ১৯৯৯), পৃঃ ৫০২। এ ধরনের চুক্তি সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, 'আর তোমাদের মালিকানাধীন দাস-দাসীদের মধ্যে কেউ তার মুক্তির জন্য লিখিত চুক্তি চাইলে, তাদের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হও' (নূর ৩৩)। -অনুবাদক

৩৯. এখানে 'ওয়ালা' (الولاء) বলতে যা বুঝানো হয়েছে তা হচ্ছে- أى وللمالك أن يعتق عبده أو أمته، أن يرد له حريته، ولكن تبقى هناك صلة بين المعتق والمعتَق، وهذه الصلة تسمى الولاء. 'মনিবের উচিত তার অধীনস্থ দাস বা দাসীকে আযাদ করা অর্থাৎ তার স্বাধীনতা ফিরিয়ে দেয়া। কিন্তু আযাদকৃত দাস বা দাসী ও আযাদকারীর মাঝে একটা সম্পর্ক রয়ে যায়। এই সম্পর্ককেই বলা হয় আল-ওয়ালা' (ড. আহমাদ আমীন, ফাজরুল ইসলাম (কায়রো : মাকতাবাতুন নাহযাতিল মিসরিইয়াহ, ১১তম সংস্করণ, ১৯৭৫), পৃঃ ৮৯। ইমাম রাগেব ইস্পাহানী (মৃঃ ৫০২ হিঃ) বলেন, الولاء فى العتق هو مايورث به 'আযাদ করার ক্ষেত্রে আল-ওয়ালা এমন একটা সম্পর্ক যার দ্বারা আযাদকৃত দাস বা দাসীর সম্পত্তির ওয়ারিছ হওয়া যায়' (রাগেব ইস্পাহানী, আল-মুফরাদাতু ফী গারীবিল কুরআন (বৈরূত : দারুল মা'রিফাহ, ২য় সংস্করণ, ১৪২০ হিঃ/১৯৯৯ খৃঃ), পৃঃ ৫৪৯। তদানীন্তন সময়ে আযাদকৃত ব্যক্তি আযাদকারীর দিকে সম্পর্কিত হত। যেমন বলা হত- زيد بن حارثة مولى رسول الله اى عتيقه 'যায়েদ বিন হারেছা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আযাদকৃত দাস'। আর দাসী হলে বলা হত هى مولاته 'সে তার আযাদকৃত দাসী'। ইসলামী শরী'আতের বিধান হচ্ছে- আযাদকৃত দাস বা দাসী যদি ওয়ারিছ না রেখে মৃত্যুবরণ করে তাহলে আযাদকারী তার সম্পত্তির ওয়ারিছ হবে (দ্রঃ বুখারী, হাদীছ নং-৬৭৫১-৫২, ৬৭৫৯-৬০, 'ফারায়েয' অধ্যায়; ফাজরুল ইসলাম, পৃঃ ৮৯। -অনুবাদক

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছাহাবীগণের মাঝে দাঁড়িয়ে আল্লাহ্র প্রশংসা ও গুণগান করে বললেন,

مَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُوْنَ شُرُوْطًا لَيْسَتْ فِىْ كِتَابِ اللهِ، فَأَيُّمَا شَرْطٍ لَيْسَ فِىْ كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ، فَقَضَاءُ اللهِ أَحَقُّ، وَشَرْطُ اللهِ أَوْثَقُ، وَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ.

'তোমাদের কিছু লোকের কি হল? এমন সব শর্ত তারা আরোপ করে, যা আল্লাহ্র কিতাবে নেই? এমন কোন শর্ত, যা আল্লাহ্র কিতাবে নেই, তা বাতিল বলে গণ্য হবে; এমনকি সে শর্ত শতবার আরোপ করলেও। কেননা আল্লাহ্র হুকুমই যথার্থ এবং আল্লাহ্র শর্তই নির্ভরযোগ্য। যে আযাদ করবে, সে-ই ওয়ালার অধিকারী হবে'।[৪০]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উক্তি 'তোমাদের কিছু লোকের কি হল'-এ কঠোর অস্বীকৃতি জ্ঞাপন লক্ষ্যণীয়। এই অস্বীকৃতি হয়ত তাদের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখার জন্য, যেন তারা এমন অবস্থানে নেই যে, তাদের নাম উল্লেখ করা সঙ্গত হবে। অথবা তাদের শর্ত অস্বীকার করার ব্যাপারে কঠোরতা অবলম্বনের দৃষ্টিকোণ থেকে। যদিও প্রথম সম্ভাবনাই উজ্জ্বল। তিনি তাদের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখার জন্যই এমনটি বলেছিলেন। কারণ কাউকে জনসম্মুখে অপমান-অপদস্থ করার জন্য বক্তৃতা বা অন্য ক্ষেত্রে তার নাম উল্লেখ করে এরূপ বলা ঠিক নয় যে, 'অমুক একথা বলেছে'।

এই হাদীছ থেকে যে ফায়েদা লাভ করা যায় তা হচ্ছে- রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উক্তি 'এমন সব শর্ত তারা আরোপ করে যা আল্লাহ্র কিতাবে নেই। আর যে শর্ত আল্লাহ্র কিতাবে নেই তা বাতিল বলে গণ্য হবে। এমনকি সে শর্ত শতবার আরোপ করলেও'। সুতরাং যে শর্ত কুরআন মাজীদ বা হাদীছে নেই তা বাতিল বলে গণ্য ও প্রত্যাখ্যাত হবে।

এক্ষণে শরী'আত বিরোধী আইন-কানূনের ব্যাপারে আপনাদের বক্তব্য কী? তা কি বাতিল বলে গণ্য হবে, না গণ্য হবে না? হ্যাঁ, ঐসব আইনের প্রণেতা যেই হৌক না কেন তা অবশ্যই বাতিল বলে গণ্য ও প্রত্যাখ্যান করা আবশ্যক হবে এবং কারো জন্য কখনো তা আঁকড়ে ধরে থাকা জায়েয হবে না। কাজেই যেসব শর্ত কুরআন মাজীদে নেই তা একশ' শর্ত হলেও বাতিল বলে গণ্য হবে। কেননা আল্লাহ্র হুকুমই যথার্থ অর্থাৎ আল্লাহ যেসব বিষয়কে শরী'আত রূপে নির্ধারণ করেছেন তা অন্য বিধান থেকে যথার্থ। মহান আল্লাহ বলেন, أَفَمَنْ يَّهْدِىْ إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُّتَّبَعَ أَمَّنْ

---

৪০. বুখারী, হাদীছ নং-২৫৬৩, 'মুকাতাব' অধ্যায়, 'মানুষের কাছে মুকাতাবের সাহায্য চাওয়া ও যাচনা করা' অনুচ্ছেদ; মুসলিম, হাদীছ নং-১৫০৪, 'দাসমুক্তি' অধ্যায়, 'মুক্তদাসে অভিভাবকত্ব হবে মুক্তিদাতার জন্য' অনুচ্ছেদ।

لَا يَهِدِّيْ إِلَّا أَنْ يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُوْنَ. 'যিনি সত্যের পথ নির্দেশ করেন তিনি আনুগত্যের অধিকতর হকদার, না যাকে পথ না দেখালে পথ পায় না- সে? তোমাদের কি হয়েছে? তোমরা কিভাবে সিদ্ধান্ত করে থাক'? *(ইউনুস ৩৫)*।

উক্ত ঘটনায় কি কঠোরতা প্রদর্শন করা হয়নি? এর জবাবে কতিপয় আলেম বলেন, এর কারণ পূর্বেই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এ সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে, যে আযাদ করবে, সে-ই ওয়ালার অধিকারী হবে। অন্যদিকে (ওয়ালা তাদের হবে এ ব্যাপারে) তাদের শর্তারোপে শরী'আতের বিধানের বিরোধিতা করা হয়েছিল। সেকারণে তাদের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বক্তব্য কঠোর হয়েছিল।

পঞ্চম দৃষ্টান্ত : যে ব্যক্তি রামাযান মাসে দিনের বেলায় তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করেছিল তার সাথে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আচরণ

আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট বসাছিলাম। ইত্যবসরে এক ব্যক্তি এসে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমি ধ্বংস হয়ে গেছি। রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'তোমার কি হয়েছে'? সে বলল, আমি ছায়েম অবস্থায় আমার স্ত্রীর সাথে সহবাস করেছি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'আযাদ করার মত কোন ক্রীতদাস তুমি পাবে কি'? সে বলল, না। তিনি বললেন, 'তুমি কি একাধারে দু'মাস ছিয়াম পালন করতে পারবে'? সে বলল, না। এরপর তিনি বললেন, 'ষাট জন মিসকীন খাওয়াতে পারবে কি'? সে বলল, না। বর্ণনাকারী বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেমে গেলেন। আমরাও এ অবস্থায় ছিলাম। এ সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে এক ঝুড়ি খেজুর পেশ করা হল। তিনি বললেন, 'প্রশ্নকারী কোথায়'? সে বলল, এইতো আমি। তিনি বললেন, خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ 'এগুলো নিয়ে ছাদাকা করে দাও'। তখন লোকটি বলল, আল্লাহ্র রাসূল! আমার চাইতেও বেশি অভাবগ্রস্তকে ছাদাকা করব? আল্লাহ্র কসম! মদীনার উভয় লাবা অর্থাৎ উভয় প্রান্তের মধ্যে আমার পরিবার-পরিজনের চেয়ে অভাবগ্রস্ত কেউ নেই। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হেসে উঠলেন এবং তাঁর দাঁত দেখা গেল। এরপর তিনি বললেন, أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ 'এগুলো তোমার পরিবারের লোকজনকে খাওয়াও'।[৪১]

[৪১]. বুখারী, হাদীছ নং-১৯৩৬, 'ছওম' অধ্যায়, 'যদি কেউ রামাযানে স্ত্রী সংগম করে এবং তার নিকট কিছু না থাকে এবং তাকে ছাদাকা দেওয়া হয়, তাহলে সে যেন তা কাফফারা স্বরূপ দিয়ে দেয়' অনুচ্ছেদ; মুসলিম, হাদীছ নং-১১১১, 'ছওম' অধ্যায়, 'রামাযানে দিনে ছায়েমের উপর স্ত্রী সহবাস করা কঠোর হারাম' অনুচ্ছেদ।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উল্লিখিত ব্যতিক্রমী আচরণের দিকে লক্ষ্য করুন! উক্ত ব্যক্তি ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে 'আমি ধ্বংস হয়ে গেছি' বলতে বলতে আসল। আর ইসলামের প্রথম দাঈ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পক্ষ থেকে সহজতা ও গনীমত লাভ করে ইসলামের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে প্রফুল্ল ও প্রশান্তচিত্তে ফিরে গেল।

আমরা মূল আলোচনায় ফিরে আসতে চাচ্ছি। আমাদের যুবকদের মাঝে অসৎকর্ম দূরীভূতকরণ, সত্যকে সত্যরূপে প্রতিষ্ঠাকরণ ও সৎকর্মকে প্রতিপন্নকরণে আগ্রহ-আবেগ, উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখে আমি সত্যিই দারুণ খুশী। তবে আল্লাহ্র কসম! আমি সর্বান্তকরণে কামনা করি যে, এ যুবকেরা তাদের কর্মকাণ্ডে হিকমত অবলম্বন করবে। এতে অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে কিছুটা বিলম্ব হলেও পরিণাম হবে ভাল। যেই যুবকের মনে আগ্রহ-উদ্দীপনার অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়েছে এবং যেখানে হিকমতের দাবী বাহাদুরী না দেখানো সেক্ষেত্রে বাহাদুরী প্রদর্শন করেছে, নিঃসন্দেহে এক্ষেত্রে বাহাদুরী দেখানো তাকে সাময়িকভাবে আনন্দিত করবে। কিন্তু এর সুদূরপ্রসারী ফল হবে বিরাট বিপর্যয়। যদি সে উদ্দিষ্ট বিষয়কে বিলম্বিত করে ধীরস্থিরতা অবলম্বন করে এবং সুদূরপ্রসারী চিন্তা-ভাবনা করে, তবে এতে প্রভূত কল্যাণ সাধিত হবে এবং সে ও তার মত যুবকেরা খারাপ পরিণতি থেকে নিস্কৃতি পাবে। আল্লাহ্র পথে দাওয়াত দেয়া, অসৎকর্মকে দূরীভূতকরণ, সত্যকে সত্যরূপে প্রতিষ্ঠিতকরণ এবং সৎ কাজের আদেশ দানের ক্ষেত্রে হিকমত অবলম্বন করা শরী'আতের দাবী। **ভাই! আপনি আপনার খেয়াল-খুশীমত শরী'আত বাস্তবায়ন করতে পারবেন না; বরং আপনার প্রভুর শরী'আত মোতাবেক আপনাকে তা বাস্তবায়ন করতে হবে।** মহান আল্লাহ বলেন, 'তুমি মানুষকে তোমার প্রতিপালকের পথে আহ্বান কর হিকমত ও সদুপদেশ দ্বারা এবং তাদের সাথে বিতর্ক করবে উত্তম পন্থায়' *(নাহল ১২৫)*।

অনুভূতিহীন অন্তরের চেয়ে নিঃসন্দেহে আগ্রহ-আবেগ ভাল। কিন্তু হিকমত অবলম্বন এ সকল কিছুর চেয়ে ঢের ভাল। অনুভূতিহীন অন্তরের অধিকারী ঐ ব্যক্তি, যে খারাপ কাজ সম্পাদিত এবং ভাল কাজ পরিত্যক্ত হতে দেখেও আন্দোলিত হয় না। আল্লাহ্র কসম! এরূপ ব্যক্তি নিকৃষ্ট। মুসলিম উম্মাহর বৈশিষ্ট্যও এরূপ নয়। কেননা মুসলিম উম্মাহ ভাল কাজের আদেশ দেয়, অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করে এবং আল্লাহ্র দিকে ডাকে। অপর পক্ষে হিকমত অবলম্বন না করাও খারাপ। আর তেজোদীপ্ত মন ও হকের জন্য আন্দোলনের মানসিকতার সাথে সাথে হিকমত অবলম্বন করা সবচেয়ে ভাল ও কল্যাণকর।

তাই আমি উদ্যমী যুবকদেরকে আল্লাহ্র পথে দাওয়াত দেয়ার ক্ষেত্রে হিকমত অবলম্বন এবং এর উপর দাওয়াতের ভিত্তি স্থাপন করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। আমি যুবকদেরকে বলছি না যে, তোমরা আন্দোলন কর না এবং আল্লাহ্র পথে না

ডেকে ফাসেককে ফাসেক রূপে এবং একনিষ্ঠ বান্দাকে একনিষ্ঠ রূপে ছেড়ে দাও। বরং আমি বলছি, তোমরা খারাপ কাজকে ঘৃণা কর, ভাল কাজকে সুপ্রতিষ্ঠিত কর এবং সাধ্যানুযায়ী দিবা-রাত্রি আল্লাহ্‌র পথে দাওয়াত দাও। মহান আল্লাহ বলেন, اِصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ. 'তোমরা ধৈর্য ধারণ কর, ধৈর্যে প্রতিযোগিতা কর এবং সদা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাক, আল্লাহকে ভয় কর যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার' *(আলে ইমরান ২০০)*। তবে আমি হিকমত ও ধীরস্থিরতা অবলম্বন এবং সম্মুখ দ্বার দিয়ে প্রবেশ করতে তথা সোজা পথ অবলম্বন করতে বলছি ও তাগিদ দিচ্ছি।

ধরুন! আমরা কোন সমাজে অসৎকর্ম সম্পাদিত হতে দেখে ঐ অসৎকর্মের উপর ঝাঁপিয়ে পড়া, ছিন্ন-ভিন্ন করা বা তা সম্পাদনকারীর সাথে কঠোরতার সাথে কথা বলা কী উচিত, না নম্রতা ও কোমলতার সাথে কথা বলা উচিত? এতে যদি কাজ হয় তাহলে ভাল কথা। অন্যথা এমন লোকদের কাছে আমরা বিষয়টি পেশ করব, যারা শাসকগোষ্ঠীর কাছে তা উত্থাপন করবেন। নিঃসন্দেহে ধীরস্থিরতা অবলম্বন করাই সর্বোত্তম। সুতরাং হে যুবক! নম্রতা-কোমলতা অবলম্বন করা তোমার জন্য আবশ্যক। যদি অসৎকর্ম দূরীভূত হওয়ার ক্ষেত্রে তা ফলপ্রসূ হয়, তাহলে তাই আমাদের ঈপ্সিত লক্ষ্য। আর যদি তাতে ফলোদয় না হয়, তাহলে আমার চেয়ে এমন উঁচু মর্যাদার ব্যক্তিদের কাছে তা পেশ করব, যারা শাসকগোষ্ঠীর কাছে তা উত্থাপন করবেন। এর মাধ্যমে দায়িত্ব মুক্ত হওয়া যায়। কেননা মহান আল্লাহ বলেছেন, فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ 'তোমরা সাধ্যানুযায়ী আল্লাহকে ভয় কর' *(তাগাবুন ১৬)*।

যদি আমরা ঐ অসৎকর্মের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ি এবং তাকে ছিন্ন-ভিন্ন করে দেই, তবে উল্টো ফল হওয়াটাই স্বাভাবিক। এতে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জিত হবে না এবং আমরা অনিষ্ট থেকেও মুক্তি পাব না। হয়তবা তা সাধারণভাবে দাওয়াতের অবয়বে কলংকের কালিমা লেপন করে দিবে। এজন্য আমি তোমাদেরকে অনুপ্রাণিত করছি এবং কথ্য ভাষায় উপদেশ দিয়ে বলছি, كُلُّ مُجَرِّبٍ خَيْرٌ مِنْ طَبِيْبٍ 'প্রত্যেক অভিজ্ঞ ব্যক্তি ডাক্তারের চেয়ে উত্তম'। আর এ ব্যাপারে আমি আল্লাহ্‌র কাছে জবাবদিহি করব। কেননা অভিজ্ঞ ব্যক্তি এমন সব সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে, যেগুলোর সমাধান সে নিজেই করেছে। কিন্তু ডাক্তার প্রেসক্রিপশন দেয় মাত্র। তা কাজে লাগতেও পারে, নাও পারে।

পঞ্চম মূলনীতি

হৃদ্যতা ও ভ্রাতৃত্ববোধ (التآلف والتواد)

ইসলামী পুনর্জাগরণকে সফল করার জন্য আমাদেরকে পরস্পর বন্ধুভাবাপন্ন দ্বীনী ভাই হতে হবে। কেননা আল্লাহ বলেছেন, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ إِخْوَةٌ 'মুমিনগণ পরস্পর ভাই ভাই' *(হুজুরাত ১০)*। আর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا. 'আর তোমরা সবাই আল্লাহ্‌র বান্দা হিসাবে পরস্পর ভাই ভাই হয়ে যাও'।[৪২]

এই ভ্রাতৃত্বের দাবী হচ্ছে- আমাদের একজন অপরজনের উপর অত্যাচার করবে না, পরস্পর বাড়াবাড়ি করবে না এবং আমরা আল্লাহ্‌র দ্বীনের ব্যাপারে বিচ্ছিন্ন না হয়ে এক উম্মাহ হয়ে যাব। কতিপয় যুবকের মাঝে যে বিরোধ দেখা দিয়েছে সে ব্যাপারে এই মূলনীতির আলোকে আমরা চিন্তা-ভাবনা ও বিচার-বিশ্লেষণ করব। বস্তুত তাদের মধ্যকার বিরোধের ব্যাপারে ইসলাম উদার দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে। এমন কিছু ইজতিহাদী মাসআলায় তাদের মাঝে বিরোধ দেখা দিয়েছে, যে ব্যাপারে ইজতিহাদ করা জায়েয আর কুরআন-সুন্নাহর দলীলও সে ব্যাপারে ইজতিহাদের সম্ভাবনা রাখে। কিন্তু কিছু মানুষ নিজে যে বিষয়কে হক বলে মনে করে তা আল্লাহ্‌র বান্দাদের উপর চাপিয়ে দিতে চায়। যদিও তার মতের বিপক্ষে অবস্থানকারী ব্যক্তি যে বিষয়ে তার মতের বিরোধিতা করেছে তাই হক।

বর্তমানে কিছু যুবক- যাদেরকে আল্লাহ হেদায়াত নসিব করেছেন এবং যারা শরী'আতের বিধি-বিধান বাস্তবায়ন করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, তাদের মধ্যে এমন বিষয়ে মতভেদের কারণে দূরত্ব লক্ষ্য করা যাচ্ছে, যে ব্যাপারে মতভেদের অবকাশ আছে। কেননা সেগুলো ইজতিহাদী বিষয়। কুরআন-সুন্নাহর দলীল এই বা সেই ব্যাখ্যার সম্ভাবনা রাখে। কিন্তু কতিপয় যুবক চায় যে, সকল মানুষ তার মতের অনুসারী হউক। যদি তারা তার মতের অনুসারী না হয়, তাহলে সে তাদেরকে ভুল ও ভ্রষ্ট পথে রয়েছে বলে মনে করে। এরূপ ধ্যান-ধারণা পোষণ করা ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) ও তৎপরবর্তী ইমামগণের আদর্শের পরিপন্থী।

---

[৪২]. বুখারী, হাদীছ নং-৬০৬৫, 'শিষ্টাচার' অধ্যায়, 'একে অন্যকে হিংসা করা এবং পরস্পর বিরোধিতা করা নিষিদ্ধ' অনুচ্ছেদ; মুসলিম, হাদীছ নং-২৫৫৯, 'সদ্ব্যবহার, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা ও শিষ্টাচার' অধ্যায়, 'পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ ও পশ্চাতে শত্রুতা হারাম' অনুচ্ছেদ।

আমি তোমাদেরকে বলছি, যদি তোমরা মতবিরোধপূর্ণ বিষয় সম্বলিত গ্রন্থগুলো দেখ তাহলে লক্ষ্য করবে যে, (বিভিন্ন বিষয়ে) ওলামায়ে কেরামের মাঝে প্রচুর মতভেদ রয়েছে। কিন্তু তাদের কেউই তার নিজস্ব মত ও ইজতিহাদের দ্বারা অন্যকে পথভ্রষ্ট আখ্যা দেননি; বরং মনে করেছেন যে, হকের অনুসরণ করা এবং এ ব্যাপারে কারো তাকলীদ না করা মানুষের জন্য আবশ্যক।[৪৩] হ্যাঁ, হক কথা বল, কিন্তু মানুষকে সেদিকে নম্রতা-কোমলতা ও সহজতার সাথে আহ্বান কর, যাতে (শুভ) পরিণতির দিকে পৌঁছতে পার।

প্রত্যেক যুবক ও ছাত্রের ঐ ব্যক্তির অনুসরণ করা উচিত যাকে সে তার দৃষ্টিতে হকের অধিক নিকটবর্তী মনে করে এবং এক্ষেত্রে যে তার বিরোধিতা করে তার কাছে ওযর পেশ করা উচিত। যদি তার সাথে তোমার মতবিরোধ হয় দলীলের ভিত্তিতে।

আমি বলছি, প্রত্যেকেই মনে করে যে, মানুষের উচিত তাকে অনুসরণ করা। মনে হয় সে নিজেই রিসালাতের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছে! আবার বলছি, তোমার বুঝকে অন্যের বিপক্ষে দলীল হিসাবে গ্রহণ করা এবং অন্যের বুঝকে তোমার বিপক্ষে দলীল হিসাবে গ্রহণ না করা কী ইনছাফ?

---

[৪৩]. তাকলীদের বিরোধিতায় চার ইমামের প্রসিদ্ধ উক্তি সমূহ নিম্নরূপ : ১. ইমাম আবূ হানীফা (৮০-১৫০হিঃ) বলেন, إِذَا صَحَّ الْحَدِيْثُ فَهُوَ مَـــذْهَبِىْ 'যখন ছহীহ হাদীছ পাবে, জেনো সেটাই আমার মাযহাব'। ২. ইমাম মালেক (৯৩-১৭৯হিঃ) বলেন, مَا مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ وَ مَأْخُوْذٌ مِنْ كَلاَمِهِ وَمَرْدُوْدٌ عَلَيْهِ إِلاَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْـــهِ وَسَـــلَّمَ. 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ব্যতীত দুনিয়াতে এমন কোন ব্যক্তি নেই, যার সকল কথা গ্রহণীয় অথবা বর্জনীয়'। ৩. ইমাম শাফেঈ (১৫০-২০৪) বলেন, إِذَا رَأَيْتُمْ كَلاَمِىْ يُخَالِفُ الْحَدِيْثَ فَاعْمَلُوْا بِالْحَدِيْثِ وَاضْرِبُوْا بِكَلاَمِىْ الْحَـــائِطَ. 'যখন তোমরা আমার কোন কথা হাদীছের বরখেলাফ দেখবে তখন হাদীছের উপর আমল করবে এবং আমার কথাকে দেওয়ালে ছুঁড়ে মারবে'। ৪. ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (১৬৪-২৪১হিঃ) বলেন, لاَتُقَلِّدْنِىْ وَلاَ تُقَلِّدَنَّ مَالِكاً وَلاَ الْاَوْزَاعِىَّ وَلاَ النَّخْعِىَّ وَلاَغَيْرَهُمْ وَخُذِ الْأَحْكَامَ مِنْ حَيْـــثُ أَخَذُوْا مِنَ الْكِتَابِ وَالـــسُّنَّةِ. 'তুমি আমার তাকলীদ কর না। তাকলীদ কর না ইমাম মালেক, আওযাঈ, নাখঈ বা অন্য কারও। বরং নির্দেশ গ্রহণ করো কুরআন ও সুন্নাহর মূল উৎস হতে- যেখান থেকে তাঁরা সমাধান গ্রহণ করতেন'। দ্রঃ শাহ অলিউল্লাহ দেহলভী, ইকদুল জীদ ফী আহকামিল ইজতিহাদি ওয়াত তাকলীদ (লাহোর : ছিদ্দীকী প্রেস, তাবি), পৃঃ ৮৪-৮৬; ইমাম আব্দুল ওয়াহ্হাব শা'রানী, কিতাবুল মীযান (দিল্লীঃ আকমালুল মাতাবে প্রেস ১২৮৬/১৮৭০ খৃঃ), ১ম খণ্ড, পৃঃ ৬৩; শায়খ মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী, ছিফাতু ছালাতিন নাবী (ছাঃ) (রিয়াদ : মাকতাবাতুল মা'আরিফ, ১৪১৭হিঃ/১৯৯৬খৃঃ), পৃঃ ৪৬-৫৩; মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, আহলেহাদীছ আন্দোলন উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিত সহ (রাজশাহীঃ হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৬), পৃঃ ১৭৭। -অনুবাদক

মুসলিম যুবকদের মাঝে এই বিভেদ দেখে ইসলামের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ কত শত্রু যে যারপর নাই আনন্দিত হয় (তার ইয়ত্তা নেই)। সে (ইসলামের শত্রু) আনন্দিত হয় এবং যে যুবক ইসলামের কালজয়ী আদর্শ গ্রহণ করেছে তাকে বিচ্ছিন্ন থাকতে দেখা সর্বান্তকরণে কামনা করে। মহান আল্লাহ বলেন, وَلاَ تَنَازَعُوْا فَتَفْشَلُوْا وَتَذْهَبَ رِيْحُكُمْ 'এবং নিজেদের মধ্যে বিবাদ করবে না, করলে তোমরা সাহস হারাবে এবং তোমাদের শক্তি বিলুপ্ত হবে' *(আনফাল ৪৬)*। তিনি আরো বলেন,

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّيْنِ مَا وَصَّى بِهِ نُوْحًا وَالَّذِىْ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيْمَ وَمُوْسَى وَعِيْسَى أَنْ أَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلاَ تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ.

'তিনি তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করেছেন দ্বীন, যার নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি নূহকে, আর যা আমি অহী করেছি তোমাকে এবং যার নির্দেশ দিয়েছিলাম ইবরাহীম, মূসা ও ঈসাকে এই বলে যে, তোমরা দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত কর এবং এ বিষয়ে মতভেদ কর না' *(শূরা ১৩)*।

হে যুবসমাজ! আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্র দ্বীনের ব্যাপারে হৃদ্যতা, ঐক্য, ধীরস্থিরতা ও দাওয়াতের ক্ষেত্রে হিকমত অবলম্বনের উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি। ইনশাআল্লাহ এর মাধ্যমেই তোমাদের জন্য বিজয় অবধারিত হবে। কেননা এর ফলে তোমরা তোমাদের কাজে সুস্পষ্ট দলীল ও আল্লাহ্র দ্বীনের ব্যাপারে জাগ্রত জ্ঞানের উপরে প্রতিষ্ঠিত থাকবে।

ষষ্ঠ মূলনীতি

ধৈর্যধারণ করা ও আল্লাহ্‌র কাছে প্রতিদান চাওয়া (الصبر والاحتساب)

ইসলামী পুনর্জাগরণ প্রত্যাশী যুবক-যুবতীরা কোন কোন সময় বাজার, স্কুল, মাদরাসা, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও তাদের বাড়ীতে কঠোরতার সম্মুখীন হয়। অনেক যুবক তাদের বাবা-মার বিরুদ্ধে এ অভিযোগ করে যে, তারা তাদের সাথে কঠোরতা অবলম্বন করে এবং তাদেরকে বিভিন্ন অসম্মানজনক নামে ডাকে। কিন্তু এসব বিষয় ও কঠোরতার ব্যাপারে আমাদের করণীয় কি? আমাদের কর্তব্য ধৈর্যধারণ করা এবং এ সমস্যা যেন আমাদেরকে আল্লাহ্‌র পথে দাওয়াত দিতে বাধা না দেয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা। কেননা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে হেদায়াত ও সত্য ধর্ম দিয়ে এ পৃথিবীতে প্রেরণ করেছিলেন। যখন তিনি হকের দিকে মানুষকে আহ্বান জানাতে লাগলেন তখন কী তাঁকে ছেড়ে দেয়া হয়েছিল, না কষ্ট দেয়া হয়েছিল? তাঁর পূর্বে যেসব নবী-রাসূলকে প্রেরণ করা হয়েছিল তাদেরকেও কী ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল, না কষ্ট দেওয়া হয়েছিল? এর জবাবে মহান আল্লাহ বলেন,

وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوْا عَلَى مَا كُذِّبُوْا وَأُوْذُوْا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا.

‘তোমার পূর্বেও অনেক রাসূলকে অবশ্যই মিথ্যাবাদী বলা হয়েছিল; কিন্তু তাদেরকে মিথ্যাবাদী বলা ও কষ্ট দেওয়া সত্ত্বেও তারা ধৈর্যধারণ করেছিল, যে পর্যন্ত না আমার সাহায্য তাদের নিকট এসেছে’ *(আন‘আম ৩৪)*। তিনি আরো বলেন, فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُوْلُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلاَ تَسْتَعْجِلْ لَّهُمْ. ‘অতএব তুমি ধৈর্যধারণ কর যেমন ধৈর্যধারণ করেছিলেন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ রাসূলগণ। আর তুমি তাদের জন্য ত্বরা কর না’ *(আহকাফ ৩৫)*।

আমি তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ধৈর্য ধারণের কতিপয় দৃষ্টান্ত উল্লেখ করব। যাতে এর দ্বারা আমরা সান্ত্বনা লাভ করতে পারি।

প্রথম দৃষ্টান্ত : মক্কার কাফেররা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ঘরের দরজার সামনে ময়লা-আবর্জনা নিক্ষেপ করত। এতদসত্ত্বেও তিনি ধৈর্যধারণ করতেন এবং বলতেন, أى جوار هذا. ‘এটা কোন ধরনের প্রতিবেশীসুলভ আচরণ’?[৪৪] অর্থাৎ তোমরা আমাকে এই কষ্টদায়ক বস্তু দ্বারা কিভাবে কষ্ট দাও? এটা কেমন প্রতিবেশীসুলভ আচরণ?

[৪৪]. ইবনু জারীর আত-তাবারী, তারীখুর রুসুল ওয়াল মুলূক ২/৩৪৩ পৃঃ।

দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত : যখন যায়েদ বিন হারেছা (রাঃ)-কে সাথে নিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তায়েফের ছাকীফ গোত্রের লোকদেরকে আল্লাহ্‌র পথে দাওয়াত দেয়ার জন্য বের হয়েছিলেন, তখন তারা তাঁর সাথে কিরূপ আচরণ করেছিল? তারা তাদের যুবকদেরকে রাস্তায় সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে তাঁর প্রতি পাথর নিক্ষেপ করতে বলে। তারা পাথর নিক্ষেপ করে তাঁর পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত রক্তাক্ত করে দেয়। এ অবস্থায় তিনি তায়েফ হতে প্রস্থান করেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘কারনুল মানাযিলে’ পৌঁছা পর্যন্ত আমি সম্বিত ফিরে পাইনি’। এমতাবস্থায় জিবরীল (আঃ) তাঁর নিকট আসলেন। তাঁর সাথে ছিলেন পাহাড়ের দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতা। জিবরীল (আঃ) তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বললেন, ইনি পাহাড়ের দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতা। তিনি আপনাকে সালাম দিয়েছেন। আপনি তাঁর সালামের জবাব দিন। অতঃপর সেই ফেরেশতা বললেন, আপনি চাইলে আমি মক্কার দু’টি পাহাড়কে (আবু কুবাইস ও কাঈকা‘আন) তাদের উপর চাপিয়ে দিতে পারি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রত্যুত্তরে বললেন, بَلْ أَرْجُوْ أَنْ يُّخْرِجَ اللهُ مِنْ أَصْلاَبِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللهَ ‘না, তা হতে পারে না। হয়ত আল্লাহ তাদের বংশ থেকে এমন সন্তান জন্ম দিবেন যে, যারা এক আল্লাহ্‌র ইবাদত করবে’।[৪৫]

তৃতীয় দৃষ্টান্ত : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কা‘বা ঘরের নিকটে সিজদাবনত ছিলেন। তিনি সবচেয়ে নিরাপদ স্থানে ইবাদত করছিলেন। কা‘বা ঘর সবচেয়ে নিরাপদ স্থান এমনকি কুরাইশদের কাছেও। কোন ব্যক্তি কা‘বা ঘরে তার বাবার হত্যাকারীকে বাগে পেয়েও হত্যা করত না। এতদসত্ত্বেও যখন তারা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে কা‘বা ঘরের নিকটে সিজদাবনত পেল তখন তাঁর সাথে কিরূপ আচরণ করল? তারা তাদের মধ্যে একজনকে উটের নাড়িভূঁড়ি নিয়ে এসে তাঁর পিঠের উপর রাখতে বলল। অথচ তিনি সে সময় সিজদাবনত ছিলেন।

জাহেলী যুগের ইতিহাসেও যে ঘটনার নযির নেই সেইরূপ বর্বরোচিত কষ্টদানের ব্যাপারে তোমরা কী বলবে? এতকিছুর পরেও তিনি ধৈর্যধারণ করেছিলেন, আল্লাহ্‌র কাছে প্রতিদান চেয়েছিলেন এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির নিমিত্তে সিজদায় পড়েছিলেন।

[৪৫]. বুখারী, হাদীছ নং-৩২৩১, ‘সৃষ্টির সূচনা’ অধ্যায়, ‘যখন তোমাদের কেউ আমীন বলে, আর আসমানের ফেরেশতাগণ আমীন বলেন এবং একের আমীন অন্যের আমীনের সাথে উচ্চারিত হয়, তখন সব গুনাহ মাফ হয়ে যায়’ অনুচ্ছেদ; মুসলিম, হাদীছ নং-১৭৯৫, ‘জিহাদ ও সিয়ার’ অধ্যায়, ‘মুশরিক ও মুনাফিকদের পক্ষ থেকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দুঃখ-কষ্ট ভোগ’ অনুচ্ছেদ।

অবশেষে তাঁর ছোট মেয়ে ফাতেমা (রাঃ) এসে বাবার পিঠ থেকে উটের নাড়িভূড়ি সরিয়ে ফেললেন। ছালাত শেষ করে তিনি দু'হাত তুলে কুরাইশদের জন্য বদদো'আ করলেন।[৪৬]

হে যুবক ভাইয়েরা! তোমরা ধৈর্যধারণ কর, ধৈর্যধারণে প্রতিযোগিতা কর এবং আনুগত্যের ব্যাপারে নিবেদিতপ্রাণ হও। আর জেনে রাখ! নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা মুত্তাকী ও সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের সাথে আছেন। তবে আমরা ধৈর্যধারণের সাথে সাথে আমাদের পরিবার-পরিজনকে আল্লাহ্‌র দিকে ডাকব, না অগ্নিশর্মা হয়ে চুপ থাকব? অবশ্যই আমরা আমাদের পরিবার-পরিজনকে আল্লাহ্‌র দিকে ডাকব এবং নিরাশ হব না। তবে হিকমত ও কোমলতার সাথে তাদেরকে ডাকব, কঠোরতার সাথে নয়। কেননা আল্লাহ্‌র দ্বীনের ব্যাপারে আবেগ-আগ্রহের প্রচণ্ডতা হেতু কেউ কেউ কখনো কখনো কঠোরতা অবলম্বন করে সংশোধনের চেয়ে বেশি গোলযোগ সৃষ্টি করতে পারে। সুতরাং মানুষকে হিকমত অবলম্বন করে প্রতিটি বিষয়কে অনুমান করতঃ তাকে যথাস্থানে রাখতে হবে।

জেনে রাখ! আল্লাহ না চাইলে মানুষেরা রাতারাতি হেদায়াতপ্রাপ্ত হবে না। কারণ আল্লাহ্‌র রীতি হচ্ছে কোন বিষয় ক্রমান্বয়ে সংঘটিত হওয়া। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মক্কায় তের বছর অবস্থান করে মানুষদেরকে আল্লাহ্‌র পথে দাওয়াত দেন। এতদসত্ত্বেও এ সময় তাঁর দাওয়াত পরিপূর্ণ সফলতা লাভ করেনি। এরপর তিনি মদীনায় দশ বছর অবস্থান করেন। এভাবে নবুওত লাভের ২৩ বছর পর দ্বীন পরিপূর্ণ হয়। সুতরাং তুমি কখনো মনে করবে না যে, মানুষেরা যে অবস্থায় রয়েছে তাথেকে রাতারাতি ফিরে আসবে। অবশ্যই এক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা বিজয় দান না করা পর্যন্ত ধৈর্যধারণ করা, ধৈর্যের সাথে পরিস্থিতির মোকাবেলা করা এবং কল্যাণের সহযাত্রী হওয়া আবশ্যক।

আমার কাছে অনেকে প্রশ্ন করে, আমি কি তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করব? আমি কি রেডিও ভেঙ্গে ফেলব? আমি কি টেপরেকর্ডার ভেঙ্গে ফেলব? আমি কি টেলিভিশন ভেঙ্গে ফেলব? আমি কি এরূপ করব? আমি কি সেরূপ করব? এক্ষেত্রে আমার বক্তব্য হচ্ছে, তুমি তোমার প্রতিপালকের পথে আহ্বান কর হিকমতের সাথে। যদি তখন অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জিত না হয়, তাহলে পাপীদের সাথে পাপাচারের সঙ্গী হয়ে

[৪৬]. বুখারী, হাদীছ নং-২৪০, 'ওযূ' অধ্যায়, 'মুছল্লীর পিঠের উপর ময়লা বা মৃত জন্তু ফেললে তার ছালাত নষ্ট হবে না' অনুচ্ছেদ; মুসলিম, হাদীছ নং-১৭৯৪, 'জিহাদ ও সিয়ার' অধ্যায়, 'মুশরিক ও মুনাফিকদের হাতে রাসূল (ছাঃ)-এর দুঃখ-কষ্ট ভোগ' অনুচ্ছেদ।

অবস্থান করা তোমার জন্য কখনো জায়েয নয়। আমি বলছি না যে, তাদের সাথে তাদের বাড়ীতে অবস্থান করা জায়েয নয়। তবে বলছি যে, তাদের পাপাচারের সঙ্গী হয়ে তাদের সাথে অবস্থান করা জায়েয নয়; বরং এক ঘর থেকে অন্য ঘরে স্থানান্তরিত হবে। কারণ যে ব্যক্তি পাপীদের পাপাচারের সঙ্গী হয়ে তাদের সাথে অবস্থান করবে সে ঐ ব্যাপারে তাদের অংশীদার বলে গণ্য হবে। মহান আল্লাহ বলেন,

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِى الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلاَ تَقْعُدُوْا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوْضُوْا فِىْ حَدِيْثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ.

'কিতাবে তোমাদের প্রতি তিনি তো অবতীর্ণ করেছেন যে, যখন তোমরা শুনবে আল্লাহ্‌র আয়াত প্রত্যাখ্যাত হচ্ছে এবং তাকে বিদ্রূপ করা হচ্ছে, তখন যে পর্যন্ত তারা অন্য প্রসঙ্গে লিপ্ত না হবে তোমরা তাদের সাথে বস না, অন্যথায় তোমরাও তাদের মত হবে' *(নিসা ১৪০)*।

কাজেই তোমাকে ধৈর্যধারণ করতে হবে এবং ধৈর্যের সাথে পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হবে। যে আজ সংশোধিত হবে না, সে কাল সংশোধিত হবে। পরিবারের লোকজনের চরিত্র সংশোধনের ব্যাপারে তুমি সহজতর বিষয় দ্বারা শুরু কর। আমি এ ব্যাপারে দৃঢ় আস্থাশীল যে, মানুষ যখন ধৈর্যধারণ করে, ধৈর্যের প্রতিযোগিতা করে এবং কোন কাজে ধারাবাহিকতা বজায় রাখে তখন সফলতা লাভ করে। মহান আল্লাহ বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা ধৈর্যধারণ কর, ধৈর্যের প্রতিযোগিতা কর এবং সদা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাক, আল্লাহ্‌কে ভয় কর যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার' *(আলে ইমরান ২০০)*।

এজন্য আমি যুবকদেরকে ধৈর্যধারণ করা এবং ধৈর্যের সাথে পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য অনুপ্রাণিত করে বলছি, তাদের সাথে তোমাদের অবস্থান যতক্ষণ ফলপ্রসূ হয়, ততক্ষণ তা কল্যাণকর। যদি এক্ষেত্রে ফলাফল লাভ করতে কিছুটা সময় লাগে এবং ক্রমান্বয়ে তা অর্জিত হয় তবুও। কারণ আমরা জানি যে, কোন কিছু গড়তে সময় লাগে, ভাঙ্গতে নয়। মনে কর! আমরা একটি মজবুত ও বৃহৎ অট্টালিকার সামনে রয়েছি এবং সেটিকে ভেঙ্গে ফেলতে চাচ্ছি। যদি এই অট্টালিকা ভাঙ্গার জন্য ১০টি ট্রাক্টর নিয়োজিত করি তাহলে একদিনেই তা ভেঙ্গে ফেলা যাবে। কিন্তু এটি নির্মাণ করতে তিন বছর বা তার বেশি সময় লাগবে।

এজন্য বোধগম্য বিষয়গুলোকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় দ্বারা পরিমাপ করা আমাদের জন্য আবশ্যক। **একটি অট্টালিকা নির্মাণ করতে যেমন তিন বছর এবং ভেঙ্গে ফেলতে তিন ঘণ্টা সময় লাগবে, তেমনি সত্যিকার মুসলিম উম্মাহ গঠনে দীর্ঘ সময় লাগবে। কাজেই আমাদের উচিত ধৈর্যধারণ করা এবং ধৈর্যের সাথে পরিস্থিতির মোকাবিলা করা।**

আমি এও বলব, যে সকল পরিবারের অভিভাকেরা তাদের ছেলে-মেয়েদের মাঝে সঠিক পথ অবলম্বনের প্রবণতা লক্ষ্য করবেন, তাদের জন্য হকের পথে দাওয়াতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা বৈধ নয়। বরং তাদের বংশধরের মাঝে এমন সন্তান প্রদানের জন্য আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় করবেন, যে তাদেরকে কল্যাণের নির্দেশ করে, ভাল কাজ করতে বলে এবং খারাপ কাজ থেকে সতর্ক ও নিষেধ করে। কেননা আল্লাহ্‌র কসম! এটা সম্পদ, অট্টালিকা, যানবাহন প্রভৃতি নে'মতের চেয়ে বড় নে'মত।

কাজেই তাদের উচিত আল্লাহ্‌র প্রশংসা করা, তাদের ছেলে-মেয়েদের উৎসাহিত করা এবং তারা যা বলে তাতে কিছুটা কঠোরতা থাকলেও তা গ্রহণ করা। কারণ সন্তানেরা তাদের দাওয়াত গ্রহণের মানসিকতা লক্ষ্য করলে তা তাদের পীড়াপীড়ি করার মানসিকতা হাল্কা করবে। কিন্তু যে বিষয়টি দাঈ যুবককে উদ্বিগ্ন ও ক্রুদ্ধ করে তা হচ্ছে- তাদের কেউ কেউ পরিবারের লোকজনের পক্ষ থেকে দাওয়াত গ্রহণের কোন মানসিকতা লক্ষ্য করে না। কাজেই তার পরিবারের লোকজনের উচিত তার দাওয়াত গ্রহণ করা, তার সাথে ভাল ব্যবহার করা এবং তাকে পরামর্শ প্রদান করা, যাতে তাদের সবার জন্যই তা প্রভূত কল্যাণ বয়ে আনে।

হে যুব সমাজ! হে আল্লাহ্‌র পথে আহ্বানকারীরা! আল্লাহ্‌র পথে আহ্বানকারী প্রত্যেককে তার দাওয়াত, আহূত বিষয়, দাওয়াতের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী এবং দাওয়াত দিতে গিয়ে দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন হওয়ার ব্যাপারে ধৈর্যশীল হতে হবে।

সপ্তম মূলনীতি

উত্তম চরিত্রে বিভূষিত হওয়া (التخلق بالأخلاق الفاضلة)

দাঈ'র উচিত দাঈর চরিত্র আঁকড়ে ধরা। আকীদা, ইবাদত, পোশাক-পরিচ্ছদ, ভাব-ভঙ্গি এবং কর্মকাণ্ডে তার মধ্যে জ্ঞানের চিহ্ন ফুটে উঠবে। যাতে সে আল্লাহ্‌র কাছে নিজেকে দাঈর নমুনা হিসাবে পেশ করতে পারে। এর ব্যত্যয় ঘটলে তার দাওয়াত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। আর যদি সফলতাও লাভ করে তবে সে সফলতা হবে নিতান্তই কম।

ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে তোমাদের ধারণা কি, যে সূদী কারবার থেকে (মানুষদেরকে) সতর্ক করে এবং সূদখোরকে বলে, তুমি তো আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছ। কেননা আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদে বলেছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ– فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَأْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللهِ وَرَسُوْلِهِ.

'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং সূদের যা বকেয়া আছে তা ছেড়ে দাও যদি তোমরা মুমিন হও। যদি তোমরা না ছাড় তবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও' *(বাকারাহ ২৭৮-৭৯)*। এই দাঈ মানুষদেরকে উপদেশ দেয় এবং আল্লাহ্‌র ভয় দেখায়। অথচ সে নিজেই সূদী কারবারে জড়িয়ে পড়ে। এটা কী দাঈর চরিত্র? কখনো না। অন্য আরেকজন দাঈ মানুষদেরকে জামা'আত তরক করা থেকে সতর্ক করে, জামা'আতে ছালাত আদায়ের কথা বলে এবং আরো বলে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ أَثْقَلَ صَلاَةٍ عَلَى الْمُنَافِقِيْنَ صَلاَةُ الْعِشَاءِ وَصَلاَةُ الْفَجْرِ وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا فِيْهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا... 'মুনাফিকদের উপর ফজর ও এশার ছালাতের চেয়ে অধিক ভারী ছালাত আর নেই। এ দু'ছালাতের কী ফযীলত, তা যদি তারা জানত, তাহলে হামাগুঁড়ি দিয়ে হলেও তারা উপস্থিত হত'।[৪৭] অথচ আমরা দেখি যে, সে নিজেই এশা ও ফজরের ছালাতের জামা'আত থেকে পিছনে পড়ে যায়। এটা কী দাঈর চরিত্র? কখনো না।

---

[৪৭]. বুখারী, হাদীছ নং-৬৫৭, 'আযান' অধ্যায়, 'এশার ছালাত জামা'আতে আদায় করার ফযীলত' অনুচ্ছেদ; মুসলিম, হাদীছ নং-৬৫১, 'মসজিদ' অধ্যায়, 'জামা'আতে ছালাত আদায়ের ফযীলত' অনুচ্ছেদ।

তৃতীয় ব্যক্তি বলে, হে আল্লাহ্‌র বান্দারা! গীবত থেকে বেঁচে থাক। কেননা গীবত কাবীরা গুনাহ। আল্লাহ তা'আলা গীবতকারীকে এমন ব্যক্তির সাথে তুলনা করেছেন যে তার মৃত ভাইয়ের গোশত ভক্ষণ করে এবং গীবত করা থেকে কঠিনভাবে সতর্ক করে। কিন্তু সে তার মজলিসে মানুষের গীবত করাকে মেওয়া মনে করে। এটা দাঈর চরিত্র নয়।

চতুর্থ ব্যক্তি মানুষকে চোগলখোরী থেকে সতর্ক করে এবং বলে, চোগলখোরী হচ্ছে কবরের আযাবের কারণ। কেননা ছহীহ হাদীছে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দু'টি কবরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বললেন,

إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِيْ كَبِيْرٍ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لاَيَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِيْ بِالنَّمِيْمَةِ.

'এদের দু'জনকে আযাব দেওয়া হচ্ছে। অথচ কোন বড় গুনাহের জন্য এদের আযাব দেওয়া হচ্ছে না। তাদের একজন তার পেশাবের নাপাকি থেকে সতর্কতা অবলম্বন করত না। আর অন্যজন চোগলখোরী করত'।[৪৮] অথচ সে মানুষের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি করে ও চোগলখোরী করে বেড়ায় এবং এ ব্যাপারে পরোয়া করে না। এটা কী দাঈর চরিত্র? কখনো না। উল্লেখ্য, মানুষের মাঝে বিবাদ সৃষ্টি করার জন্য একের কথা অন্যকে বলে বেড়ানোকে চোগলখোরী বলে।

কাজেই দাঈ ইবাদত, আচার-আচরণ, চরিত্র যে বিষয়েই মানুষকে দাওয়াত দিবেন সে বিষয়ে নিজে উত্তম চরিত্রে বিভূষিত হবেন। যাতে তার দাওয়াত গ্রহণযোগ্য হয় এবং যাদের দ্বারা জাহান্নামের আগুন প্রজ্জ্বলিত করা হবে তিনি যেন তাদের প্রথম ব্যক্তি না হন। আমরা এথেকে আল্লাহ্‌র কাছে পানাহ চাচ্ছি।

বন্ধুগণ! আমরা যদি আমাদের অবস্থার দিকে লক্ষ্য করি তবে দেখবে যে, আমরা হয়ত কোন বিষয়ে মানুষকে আহ্বান করি কিন্তু নিজে তা পালন করি না। নিঃসন্দেহে এটা একটি বড় ত্রুটি। হে আল্লাহ! আমাদের ও তাদের দৃষ্টিকে অধিক কল্যাণকর বিষয়ের দিকে ফিরিয়ে দাও। যদি কোন ব্যক্তি আল্লাহ্‌র পথে জিহাদের জন্য আহ্বান করে, এ ব্যাপারে মানুষদেরকে উৎসাহিত করে এবং তাদেরকে

[৪৮]. বুখারী, হাদীছ নং-২১৬, 'ওযূ' অধ্যায়, 'পেশাবের অপবিত্রতা থেকে সতর্ক না থাকা কাবীরা গুনাহ' অনুচ্ছেদ; মুসলিম, হাদীছ নং-২৯২, 'পবিত্রতা' অধ্যায়, 'পেশাব অপবিত্র হবার দলীল এবং তা থেকে বেঁচে থাকা অবশ্য যরূরী' অনুচ্ছেদ।

সাধ্যানুযায়ী ধন-সম্পদ ও শারীরিক শক্তি দ্বারা সাহস যোগায়, কিন্তু সে জিহাদের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কল্যাণকর বিষয়ে ব্যস্ত থাকে তবে এমতাবস্থায় বলা যাবে না যে, তিনি আহূত বিষয়ে নিজে আমল করেননি। ধরুন, একজন আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদের জন্য আহ্বান করে। কিন্তু সে যে দেশে বসবাস করে সে দেশের মানুষের মাঝে শারঈ জ্ঞান প্রচার-প্রসার বেশি প্রয়োজন, তাহলে তীর-ধনুক তথা অস্ত্র দিয়ে জিহাদ করার চেয়ে জ্ঞান ও বক্তৃতার দ্বারা তার জন্য জিহাদ করাই সর্বোত্তম। কেননা প্রত্যেকটি বিষয়ের উপযুক্ত ক্ষেত্র রয়েছে। তাই কোন বিষয় প্রাধান্য লাভ করা নির্ভর করে স্থান-কাল-পাত্রের উপর।

এজন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কতিপয় অভ্যাসের দিকে আহ্বান করতেন। কিন্তু কখনো কখনো তিনি তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ব্যস্ত থাকতেন। কখনো ধারাবাহিকভাবে ছিয়াম পালন করতে থাকতেন এমনকি বলা হত যে, তিনি আর ছিয়াম ভঙ্গ করবেন না। আবার কখনো ছিয়াম ভঙ্গ করতেন, এমনকি বলা হত যে, তিনি হয়ত আর ছিয়াম-ই পালন করবেন না।

বন্ধুরা! আমি প্রত্যেক দাঈর কাছে এমন চরিত্রে বিভূষিত হওয়ার প্রত্যাশা করি যা দাঈর চরিত্রের সাথে মানানসই। যাতে তিনি প্রকৃত দাঈ হতে পারেন এবং তার কথা গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে।

অষ্টম মূলনীতি
দাঈ ও মানুষের মাঝে দূরত্বের প্রাচীর ভেঙ্গে ফেলা

(كسر الحواجز بين الداعية وبين الناس)

আমাদের অনেক দাঈ ভাই কোন সম্প্রদায়কে খারাপ কাজে লিপ্ত দেখে আবেগতাড়িত হয়ে ঘৃণাবশত তাদের কাছে যেতে ও উপদেশ দিতে চান না। এটা ভুল। এটা কখনো হিকমত অবলম্বন নয়। বরং হিকমত হচ্ছে তাদের কাছে যাওয়া, দাওয়াত দেয়া, উৎসাহ যোগানো এবং (জাহান্নামের আযাবের) ভয় দেখানো। আর কখনো আপনি বলবেন না যে, এরা সব ফাসেক। তাদের সাথে বসা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

হে দাঈ! আপনি যদি তাদের সাথে বসতে ও চলতে না চান এবং তাদেরকে আল্লাহ্র দিকে ডাকতে না যান, তাহলে কে তাদের দায়িত্ব গ্রহণ করবে? তাদের মত একজন পাপী ব্যক্তি কী তাদের দায়িত্ব গ্রহণ করবে? না এমন লোকজন তাদের দায়িত্ব গ্রহণ করবে যারা তাদেরকে চিনে না?

দাঈর উচিত ধৈর্যধারণ করা, মানুষকে দাওয়াত দেওয়াতে নিজেকে অভ্যস্থ করা এবং তার ও মানুষের মাঝে দূরত্বের প্রাচীর ভেঙ্গে ফেলা। যাতে তিনি তার দাওয়াত এমন লোকদের কাছে পৌঁছাতে সক্ষম হন যারা দাওয়াতের মুখাপেক্ষী। অপর পক্ষে গর্ব করে বলা, 'যদি আমার কাছে কেউ আসে তাহলে আমি তাকে দাওয়াত দেব আর যদি না আসে তাহলে আমি দাওয়াত দিতে বাধ্য নই'- এটা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর রীতি বিরোধী।

যারা ইতিহাস অধ্যয়ন করেন তারা জানেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হজ্জের মওসুমে মীনায় অবস্থানের দিনগুলোতে মুশরিকদের আবাসস্থলে গিয়ে তাদেরকে আল্লাহ্র দিকে ডাকতেন। তাঁর থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, هَلْ مِنْ رَجُلٍ يَحْمِلُنِيْ إِلَى قَوْمِه لِأُبَلِّغَ كَلاَمَ رَبِّيْ، فَإِنَّ قُرَيْشًا مَنَعُوْنِيْ أَنْ أُبَلِّغَ كَلاَمَ رَبِّيْ عَزَّ وَجَلَّ. 'এমন কেউ আছে কি যে আমাকে তার সম্প্রদায়ের কাছে নিয়ে যাবে। যাতে আমি (তাদের কাছে) আমার প্রভুর বাণী পৌঁছিয়ে দিতে পারি। কেননা কুরাইশরা আমার প্রভুর বাণী (মানুষদের কাছে) পৌঁছিয়ে দিতে বাধা দিয়েছে'।[৪৯]

এটাই যদি আমাদের নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর রীতি হয়, তাহলে আল্লাহ্র পথে দাওয়াত দেয়ার ক্ষেত্রে আমাদের তাঁর মত হওয়া উচিত।

[৪৯]. আহমাদ ৩/৩৯০ পৃঃ; আবূদাঊদ, হাদীছ নং-৪৭৩৪, 'সুন্নাহ' অধ্যায়, 'কুরআন' অনুচ্ছেদ; তিরমিযী, হাদীছ নং-২৯২৫, 'ফাযায়েলুল কুরআন' অধ্যায়; ইবনু মাজাহ, হাদীছ নং-২০১, 'জাহমিয়ারা যেসব বিষয় অস্বীকার করেছে' অনুচ্ছেদ, হাদীছটি ছহীহ ।

নবম মূলনীতি
নম্র ও কোমল ব্যবহার (استعمال الرفق واللين)

আল্লাহ্র দিকে ডাকার ক্ষেত্রে যথাসাধ্য নম্র ও কোমল ব্যবহার করতে হবে। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

يَا عَائِشَةُ! إِنَّ اللهَ رَفِيْقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ، وَيُعْطِيْ عَلَى الرِّفْقِ مَالاَ يُعْطِيْ عَلَى الْعُنْفِ، وَمَا لاَيُعْطِيْ عَلَى سِوَاهُ.

'হে আয়েশা! আল্লাহ তা'আলা নম্র ব্যবহারকারী। তিনি নম্রতা পছন্দ করেন। তিনি নম্রতার জন্য এমন কিছু দান করেন যা কঠোরতার জন্য দান করেন না; আর অন্য কোন কিছুর জন্যও তা দান করেন না'।[৫০] আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে তাঁর বান্দাদের জন্য নম্র করে তাঁর প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন,

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْكُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لاَنْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ.

'আল্লাহ্র দয়ায় তুমি তাদের প্রতি কোমল হৃদয় হয়েছিলে; যদি তুমি রূঢ় ও কঠোরচিত্ত হতে তবে তারা তোমার আশপাশ হতে সরে পড়ত' *(আলে ইমরান ১৫৯)*।

তুমি নিজেকে দিয়ে মানুষকে বিচার কর। যদি কেউ তোমাকে কোন বিষয়ে কঠোরতার সাথে সম্বোধন করে, তাহলে তোমার সাথে সে যেরূপ আচরণ করেছে তার সাথে সেরূপ আচরণ করতে তোমার মন তোমাকে প্রলুব্ধ করবে এবং শয়তান তোমাকে প্ররোচিত করে বলবে যে, এই ব্যক্তি তোমাকে নছীহত করতে চায় না; সে সমালোচনা করতে চায়। আর মানুষের স্বভাব হচ্ছে যখন সে উপলব্ধি করবে যে, যে তাকে সম্বোধন করছে সে তার সমালোচনা করতে চায় তখন সে তার দিকনির্দেশনা ও দাওয়াতের দিকে দৃকপাত করবে না। কিন্তু যদি দা'ঈ নম্রতা ও কোমলতার সাথে ঐ ব্যক্তিকে বলে যে, এ কাজ করা ঠিক নয়। অতঃপর তার জন্য অবৈধ পন্থা অবলম্বনের দ্বার রুদ্ধ করে হালাল পন্থা বাতলিয়ে দিলে তাতে প্রভূত কল্যাণ সাধিত হবে।

[৫০]. মুসলিম, হাদীছ নং-২৫৯৩, 'সদ্ব্যবহার, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা ও শিষ্টাচার' অধ্যায়, 'নম্র ব্যবহারের ফযীলত' অনুচ্ছেদ।

আমি এতক্ষণ তোমাদেরকে যা বললাম তা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশনা এবং তাঁর [রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)] অনুসৃত পদ্ধতি। আমি তোমাদের জন্য আল্লাহ তা'আলার বাণী দ্বারা দৃষ্টান্ত পেশ করছি। মহান আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لاَتَقُوْلُوْا رَاعِنَا وَقُوْلُوا انْظُرْنَا. 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা 'রাঈনা' বলো না, বরং 'উনযুরনা' বলো' *(বাকারাহ ১০৪)*।[৫১] আল্লাহ অত্র আয়াতে একটি শব্দ বলতে নিষেধ করার সাথে সাথে তার পরিবর্তে অন্য আরেকটি শব্দ ব্যবহারের দিকনির্দেশনা প্রদান করে বলেন, 'তোমরা 'রাঈনা' বলো না; বরং 'উনযুরনা' বলো'। সুতরাং তুমি যখন মানুষের জন্য এমন একটি দ্বার বন্ধ করে দিবে যে দ্বার দিয়ে প্রবেশ করতে আল্লাহ নিষেধ করেছেন, তখন তাদের জন্য হালাল দ্বার খুলে দিবে তথা হালাল পন্থা বাতলিয়ে দিবে। কারণ মানুষকে অবশ্যই নড়াচড়া ও কাজ করতে হবে। যেমন হাদীছে এসেছে,.أَصْدَقُ الْأَسْمَاءِ حَارِثٌ وَهَمَّامٌ 'সব থেকে যথার্থ নাম হচ্ছে 'হারেছ' (পরিশ্রমী) ও 'হাম্মাম' (আগ্রহী, আকাঙ্ক্ষী)'।[৫২]

যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে উৎকৃষ্ট খেজুর নিয়ে আসা হল তখন তিনি এই নীতি অবলম্বন করে বললেন, أَكُلُّ تَمَرِ خَيْبَرَ هَكَذَا؟ 'খায়বারের সব খেজুর কী এ রকমের'? ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) বললেন, না। বরং আমরা দু' ছা' এর পরিবর্তে এ ধরনের এক ছা' এবং তিন ছা' এর পরিবর্তে এর দু' ছা' খেজুর নিয়ে থাকি। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, .لاَ تَفْعَلْ، بِعِ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ، ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيْبًا 'এরূপ করবে না। বরং মিশ্রিত খেজুর দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করে দিরহাম দিয়ে

[৫১]. رَاعِنَا শব্দটি مراعة হতে ব্যুৎপত্তিসিদ্ধ। رعى অর্থ : অন্যকে রক্ষা করা বা দেখাশুনা করা। মুমিনগণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে কথোপকথনের সময় এই শব্দ ব্যবহার করত। অর্থ : 'আমাদের দিকে লক্ষ্য করুন ও ধীরে চলুন'। এই শব্দটি ইহুদীদের ভাষায় 'ভর্ৎসনা' অর্থে ব্যবহৃত হত। رعونة হতে নির্গত অর্থে 'হে বোকা'। মুমিনগণকে এই শব্দ ব্যবহার করতে দেখে তারাও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে তা ব্যবহার করে পরস্পরের মধ্যে হাসি-ঠাট্টা করত। সুতরাং মুমিনগণকে উক্ত শব্দ পরিহার করে পরিস্কার অর্থবোধক শব্দ انظرنا (আমাদের প্রতি লক্ষ্য করুন) ব্যবহার করতে বলা হয়েছে (বিস্তারিত আলোচনা দ্রঃ তাফসীরে তাবারী (বৈরূত : দারুল মা'রিফাহ, ১৪০৬/১৯৮৬), ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৭৩-৭৫; তাফসীর ইবনে কাছীর ২/৫-৭ প্রভৃতি)।-অনুবাদক

[৫২]. আহমাদ ৪/৩৪৫ পৃঃ; আবূ দাঊদ, হাদীছ নং-৪৯৫০, 'শিষ্টাচার' অধ্যায়, 'নাম পরিবর্তন করা' অনুচ্ছেদ, হাদীছটি ছহীহ।

'জানীব' (উৎকৃষ্ট) খেজুর ক্রয় করবে'।[৫৩] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদেরকে হালাল উপায়ের সন্ধান দিয়ে দিরহামের বিনিময়ে খারাপ খেজুর বিক্রি করে তা দ্বারা উৎকৃষ্ট খেজুর ক্রয় করতে বললেন। তিনি তাদের জন্য হারাম পন্থা নিষিদ্ধ করার সাথে সাথে বৈধ পন্থা বাতলিয়ে দিলেন। কাজেই দাঈর কর্তব্য হল যখন তিনি মানুষের জন্য অবৈধ বিষয় উল্লেখ করবেন তখন বৈধ বিষয় বলে দিবেন।

যে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আদর্শ অনুসন্ধান করবে সে তাঁকে উম্মতের প্রতি কোমল ব্যবহারকারী রূপে পাবে। এর জাজ্বল্য দৃষ্টান্ত হচ্ছে ঐ বেদুঈনের ঘটনা যে মসজিদে প্রবেশ করে এক পার্শ্বে গিয়ে পেশাব করতে শুরু করেছিল। এতে লোকজন তার দিকে ছুটে গিয়ে তাকে ধমকাতে লাগল। কেননা সে খুবই নিকৃষ্ট কাজ করেছিল। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদেরকে ধমক দিলে তারা চুপ হয়ে গেল। বেদুঈন পেশাব করা শেষ করলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পেশাবের উপর এক বালতি পানি ঢেলে দিতে বললেন। এতে অপবিত্রতা দূরীভূত হল। অতঃপর বেদুঈনকে ডেকে বললেন,

إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لاَيَصْلُحُ فِيْهَا شَيْءٌ مِنَ الْأَذَى أَوِ الْقَذَرِ، وَإِنَّمَا هِيَ لِلصَّلاَةِ وَالتَّكْبِيْرِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ.

'এই মসজিদ সমূহে কোন প্রকার কষ্টদায়ক বস্তু রাখা বা একে কোন প্রকার নাপাক করা সঙ্গত নয়। এসবতো শুধু ছালাত আদায় করা, তাকবীর বলা ও কুরআন তেলাওয়াত করার জন্য'।[৫৪] অথবা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অনুরূপ কিছু বলেছিলেন। আর মুসনাদে আহমাদে এসেছে যে, ঐ লোকটি বলেছিল, اَللَّهُمَّ ارْحَمْنِىْ وَمُحَمَّدًا وَلاَ تَرْحَمْ مَعَنَا أَحَدًا. 'হে আল্লাহ! আমার এবং মুহাম্মাদের উপর রহম কর এবং আমাদের সাথে কারো প্রতি রহম কর না'।[৫৫] কারণ মুহাম্মাদ (ছাঃ) তার সাথে নম্র ব্যবহার করেছিলেন এবং তাকে শিষ্টাচার শিক্ষা দিয়েছিলেন।

আল্লাহ্র পথে দাওয়াত দেওয়া এবং অসৎকর্মকে অস্বীকার করার ব্যাপারে এই পদ্ধতি অবলম্বন করার জন্য আমি ভ্রাতৃবর্গকে আহ্বান জানাচ্ছি। নম্রতা অবলম্বনের মাধ্যমে এমন সাফল্য অর্জিত হবে যা কঠোরতার মাধ্যমে অর্জিত হবে না।

[৫৩]. বুখারী, হাদীছ নং-২২০১-২২০২, 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়, 'উৎকৃষ্ট খেজুরের বিনিময়ে খেজুর বিক্রি করতে চাইলে' অনুচ্ছেদ; মুসলিম, হাদীছ নং-১৫৯৩, 'মুসাকাত' অধ্যায়।

[৫৪]. মুসলিম, হাদীছ নং-২৮৫, 'পবিত্রতা' অধ্যায়, 'মসজিদে পেশাব এবং অন্যান্য নাপাকী পড়লে তা ধুয়ে ফেলা যরূরী' অনুচ্ছেদ।

[৫৫]. মুসনাদে আহমাদ ২/২৩৯ পৃঃ।

দশম মূলনীতি

ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতবিরোধের ব্যাপারে যুবকদের উদার দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ

(اتساع صدور الشباب للخلاف بين العلماء)

ওলামায়ে কেরাম ও অন্যদের মাঝে যে মতবিরোধ রয়েছে সে ব্যাপারে দাঈ যুবক ও দায়িত্বশীলদের উদার দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করা উচিত এবং তাদের আকীদা অনুযায়ী যারা ভুল পথ অবলম্বন করেছে তাদের ক্ষেত্রে এ মতভেদকে ওযর হিসাবে গ্রহণ করা উচিত। এটা একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট। কেননা অনেকে অন্যদের সম্মান ক্ষুণ্ণ ও সমালোচনা করার জন্য তাদের ভুল-ত্রুটিগুলো খুঁজে বেড়ায়। এটা বড় ভুল। যদি সাধারণ লোকের গীবত করা কাবীরা গুনাহ হয় তাহলে কোন আলেমের গীবত করা আরো বড় গুনাহ। কেননা কোন আলেমের গীবত করলে তার ক্ষতি শুধু আলেমের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না; বরং তার ও সে যে শারঈ জ্ঞানের অধিকারী তার উপরও পড়ে। আর মানুষ যখন কোন আলেমের ব্যাপারে উদাসীন হয় অথবা তিনি তাদের দৃষ্টির অগোচরে চলে যান, তখন তার বক্তব্যও তাদের গোচরীভূত হয় না। যেহেতু তিনি হক কথা বলতেন এবং সেদিকে মানুষকে আহ্বান করতেন সেহেতু ঐ আলেমের গীবত করা মানুষ ও তার শারঈ জ্ঞানের মাঝে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। এর ভয়াবহতা অনেক বেশি।

আমার মতে ওলামায়ে কেরামের মাঝে যে মতবিরোধ চলছে সেগুলোকে যুবকেরা ভাল নিয়ত ও ইজতিহাদের উপর অর্পণ করবে এবং তারা যেসব মাসআলায় ভুল করেছেন সেক্ষেত্রে তাদেরকে মা'যূর মনে করবে। যুবকেরা যেসব বিষয়কে ভুল মনে করে সে ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের সাথে কথা বলতে কোন বাধা নেই। যাতে তারা তাদেরকে ব্যাখ্যা করতে পারেন যে, তাদের পক্ষ থেকে কি ভুল হয়েছে, না যারা বলেছে যে তারা ভুল করেছেন তাদের পক্ষ থেকে? কারণ মানুষ কখনো মনে করে, অমুক আলেমের কথা ভুল। কিন্তু আলোচনা-পর্যালোচনার পর তার কথার যথার্থতা তার কাছে প্রস্ফুটিত হয়। আর মানুষের ভুল হওয়াটাই স্বাভাবিক। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, كُلُّ ابْنِ آدَمَ خَطَّاءٌ، وَخَيْرُ الْخَطَّائِيْنَ التَّوَّابُوْنَ. 'প্রত্যেক আদম সন্তান ভুল করে। আর যারা তওবা করে তারাই শ্রেষ্ঠ ভুলকারী'।[৫৬] পক্ষান্তরে কোন আলেমের পদস্খলন ঘটলে বা তিনি ভুল করলে তা মানুষের মাঝে ছড়িয়ে পড়াতে আনন্দিত হলে দলাদলির সৃষ্টি হয়। আর এটা সালাফে ছালেহীনের পদ্ধতিও নয়।

[৫৬]. আহমাদ ৩/১৯৮ পৃঃ; তিরমিযী, হাদীছ নং-২৪৯৯, 'কিয়ামতের অবস্থা' অধ্যায়; ইবনু মাজাহ, হাদীছ নং-৪২৫১, 'আধ্যাত্মিকতা' অধ্যায়, 'তওবা' অনুচ্ছেদ, হাদীছ হাসান।

অনুরূপভাবে রাষ্ট্রপ্রধানদের মধ্যে যে ভুল-ভ্রান্তি পরিলক্ষিত হয় সেগুলোকে তাদের প্রত্যেকটি কাজে অপবাদ দেয়ার মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করা এবং তাদের ভাল কাজগুলো থেকে আমাদের দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়া ঠিক নয়। কেননা আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদে বলেন, 'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে ন্যায় সাক্ষ্যদানের ব্যাপারে অবিচল থাকবে এবং কোন সম্প্রদায়ের শত্রুতার কারণে কখনো ন্যায়বিচার পরিত্যাগ কর না' *(মায়েদাহ ৮)*। অর্থাৎ কোন সম্প্রদায়ের প্রতি ক্রোধ যেন তোমাদেরকে অবিচার করার প্রতি প্রলুব্ধ না করে। কারণ ন্যায়বিচার করা ওয়াজিব। কোন রাষ্ট্রপ্রধান, আলেম বা অন্যদের ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলো মানুষের মাঝে প্রচার করে তাদের ভাল কাজগুলো সম্পর্কে চুপ থাকা কারো জন্য বৈধ নয়। কেননা এটা ইনছাফ পরিপন্থী।

তুমি নিজের ক্ষেত্রে বিষয়টিকে এভাবে বিবেচনা কর যে, যদি কেউ তোমার বিরুদ্ধে উঠেপড়ে লাগে এবং তোমার ভাল ও সঠিক কাজগুলো গোপন রেখে তোমার ত্রুটি-বিচ্যুতি ও খারাপ কাজগুলোকে প্রচার করতে থাকে, তাহলে এটাকে তুমি তার পক্ষ থেকে তোমার উপর চাপিয়ে দেয়া একটা অপরাধ হিসাবে গণ্য করবে। তুমি যদি নিজের ক্ষেত্রে এমনটা বিবেচনা কর, তাহলে অন্যদের ক্ষেত্রেও তা বিবেচনা করা তোমার কর্তব্য। আমি একটু আগে ইঙ্গিত দিয়েছি যে, তুমি যে বিষয়টিকে ভুল বলে মনে করছ সে বিষয়ে ঐ ব্যক্তির সাথে তোমার মিলিত হওয়া এবং আলোচনা করা উচিত, যাকে তুমি ভুলে নিপতিত বলে মনে করছ। আলোচনা-পর্যালোচনার পর তার অবস্থান পরিস্কার হবে।

আলোচনা-পর্যালোচনার পর কত মানুষ তার মত পরিহার করে সঠিক মত গ্রহণ করেছে, আর কত মানুষের সাথে আলোচনা করার পর তার কথাই সঠিক বলে প্রতীয়মান হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। অথচ আমরা ধারণা করেছিলাম যে, সে ভুলে নিপতিত রয়েছে। আমাদের মনে রাখা উচিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বাণী : اَلْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا. 'মুমিন মুমিনের জন্য ইমারতের ন্যায় যার এক অংশ অন্য অংশকে মজবুত করে'।[৫৭] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরো বলেন,

مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُزَحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَيَدْخُلَ الْجَنَّةَ فَلْتَأْتِه مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِىْ يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ.

'যে ব্যক্তি জাহান্নাম থেকে দূরে থাকতে চায় এবং জান্নাতে প্রবেশ করতে চায়- তার মৃত্যু যেন এমন অবস্থায় আসে যে, সে আল্লাহ্‌র এবং আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখে এবং সে যেন মানুষের সাথে এমন আচরণ করে যে আচরণ সে তার নিজের জন্য পছন্দ করে'।[৫৮] এটাই হচ্ছে ন্যায়পরায়ণতা ও সঠিক পথ।

[৫৭]. বুখারী, হাদীছ নং-৬০২৬; মুসলিম, হাদীছ নং-২৫৮৫।

[৫৮]. মুসলিম, হাদীছ নং-১৮৪৪, 'ইমারত' অধ্যায়।

একাদশ মূলনীতি
শরী'আত ও বিবেকের দাবী অনুযায়ী আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করা

(تقييد العاطفة بما يقتضيه الشرع والعقل)

ইসলামী পুনর্জাগরণ ও বরকতময় আন্দোলনের লোকদেরকে আবেগ যেন প্রলুব্ধ-প্ররোচিত করে বিবেকবোধ এবং শরী'আতের দাবী অনুযায়ী সঠিক পথে চলা থেকে বিরত না রাখে। কারণ আবেগ যদি শরী'আত ও বিবেকের দাবী অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত না হয়, তাহলে তা হবে ঘূর্ণিঝড় সদৃশ। এক্ষেত্রে কল্যাণের চেয়ে অকল্যাণই বেশি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এজন্য আমাদের চিন্তা-চেতনা হবে সুদূরপ্রসারী। তবে একথার দ্বারা আমি বুঝাতে চাচ্ছি না যে, বাতিলের ব্যাপারে আমরা চুপ থাকব বা বাতিলকে সমর্থন করব। আমি বলতে চাচ্ছি যে, আমাদেরকে সঠিক পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে এবং বাতিলকে দূরীভূতকরণ ও তার মূলোৎপাটনের জন্য সাধ্যানুযায়ী হিকমত অবলম্বন করতে হবে। কেননা হিকমত অবলম্বন করার পথ দীর্ঘ হলেও তার ফল হবে সবার জন্য সুখকর। আবেগ হয়ত অগ্নিশিখাকে নির্বাপিত করতে পারবে। কিন্তু জ্বলন্ত অঙ্গারকে নির্বাপিত করতে পারবে না। যেই অঙ্গার হয়ত পরবর্তীতে জ্বলে উঠবে।

এজন্য ইসলামী আন্দোলন ও জাগরণের নেতৃত্ব দানকারী ভ্রাতৃবর্গ ও যুবকদেরকে ধীরস্থিরতা অবলম্বন, দূরদৃষ্টি পোষণ ও বিচক্ষণতার পরিচয় দেয়ার জন্য আমি উদ্বুদ্ধ করছি। তারা যেন তাদের যাবতীয় কর্মকে শরী'আতের বিধানের আলোকে পরিচালিত করে এবং আল্লাহ্র পথে দাওয়াত দেয়া ও অসৎ কর্মকে দূরীভূতকরণে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হিকমত অবলম্বনের দিকে দৃষ্টিপাত করে। যাতে তারা তাঁর কাছ থেকে উত্তম নমুনা গ্রহণ করতে পারে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আদর্শ কতইনা উত্তম!

ইসলামী পুনর্জাগরণ প্রত্যাশী যুবকদের বলব, আমরা যদি মুসলিম উম্মাহকে তাদের নিদ্রা ও অসচেতনতা থেকে জাগিয়ে তুলতে চাই তাহলে আমাদেরকে সুদৃঢ় পরিকল্পনা ও ভিত্তির উপর চলতে হবে। কারণ আমরা আল্লাহ্র বিধান কার্যকর এবং আল্লাহ্র যমীনে তার বান্দাদের মাঝে তাঁর দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই। এটা মহৎ লক্ষ্য। কিন্তু শুধু আবেগ দ্বারা এই লক্ষ্য অর্জিত হবে না। তাই আমাদের আবেগকে শরী'আতের বিধান ও বিবেক দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

দ্বাদশ মূলনীতি
যুবকদের মাঝে ভ্রমণ ও শিক্ষা সফরের ব্যবস্থা করা

(إقامة الزيارات والرحلات بين الشباب)

আমি যুবকদেরকে তাদের মাঝে ভ্রমণের ব্যবস্থা করার জন্য উৎসাহিত করব, যাতে তাদের মাঝে ভ্রাতৃত্ববোধ ও ভালবাসার বন্ধন সুদৃঢ় হয়। তাদের উচিত মুসলিম উম্মাহ্র ইতিহাস-ঐতিহ্য অধ্যয়ন করা, যাতে তারা এক অন্তর ও এক ব্যক্তির ন্যায় হতে পারে। কাছে বা দূরে যেখানেই হোক না কেন ভ্রমণের অনেক উপকারিতা রয়েছে। এক্ষেত্রে শিক্ষক ও প্রতিষ্ঠানের প্রধানদের অগ্রণী ভূমিকা পালন করা দরকার।

ত্রয়োদশ মূলনীতি
ফিতনা-ফাসাদের আধিক্য দেখে নিরাশ না হওয়া

(عدم اليأس من كثرة المفاسد)

মুসলিম উম্মাহ্র মাঝে ফিতনা-ফাসাদের আধিক্য এবং হকের প্রতিরোধকারীদের দোর্দণ্ড প্রতাপ দেখে সংশোধনের ব্যাপারে নিরাশ হওয়া উচিত নয়। কারণ ইবনুল কাইয়িম (রহঃ)-এর বর্ণনা অনুযায়ী হক বা সত্যের স্বরূপ হচ্ছে-

اَلْحَقُّ مَنْصُوْرٌ وَمُمْتَحَنٌ فَلاَ * تَعْجَبْ فَهَذِىْ سُنَّةُ الرَّحْمَنِ.

'হক বিজিত ও পরীক্ষিত হবে- তাতে বিস্ময়ের কি আছে? কারণ এটাই তো আল্লাহ্র রীতি'।

হকের সাথে বাতিলের লড়াই চলবেই। মহান আল্লাহ বলেন, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِيْنَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَّنَصِيْرًا. 'এভাবে প্রত্যেক নবীর শত্রু করেছিলাম আমি অপরাধীদেরকে। তোমার জন্য তোমার প্রতিপালকই পথপ্রদর্শক ও সাহায্যকারীরূপে যথেষ্ট' *(ফুরকান ৩১)*।

অপরাধীরা মানুষকে পথভ্রষ্ট, হককে অকার্যকর এবং মানুষকে নিশ্চুপ করে তাদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করতে চায়। কিন্তু আল্লাহ বলছেন, নবীদের শত্রুদের মধ্যে যে তাঁকে [রাসূল (ছাঃ)] পথভ্রষ্ট করতে এবং বাধা দিতে চায় তার ক্ষেত্রে 'তোমার জন্য

তোমার প্রতিপালকই পথপ্রদর্শক ও সাহায্যকারীরূপে যথেষ্ট'। কাজেই আমাদের নিরাশ হওয়া উচিত নয়; বরং অপেক্ষা করা ও আশান্বিত হওয়া দরকার। অচিরেই মুত্তাকীদের জন্য শুভ পরিণতি নির্ধারিত হবে।

সমাজে এমন অনেক লোক আছে যারা বাতিল চিন্তাধারা দ্বারা যুবকের সঠিক চিন্তাধারাকে পরিবর্তন করতে চায়। তারা এ হীন উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায় এমনকি মানুষদেরকে পথভ্রষ্ট ও সন্দিগ্ধ করে এবং তাদেরকে হক পথের অনুসারী হতে বাধা দেয়। কিন্তু অচিরেই গ্যাড়াকলে তারাই পড়বে। যে ব্যক্তি তার চিন্তাধারার দ্বারা হককে প্রত্যাখ্যান করতে চাইবে, সেই গ্যাড়াকলে পড়বে। কেননা আল্লাহ তা'আলাই হচ্ছেন তাঁর দ্বীন ও কিতাব কুরআন মাজীদের সাহায্যকারী। কাজেই দাওয়াতী কর্মকাণ্ড অব্যাহত রাখা এবং তাকে সফলতার স্বর্ণশিখরে পৌঁছানোর চেষ্টা করার ব্যাপারে আশান্বিত হওয়া শক্তিশালী চালিকাশক্তি। তদ্রূপ নিরাশ হওয়া ব্যর্থতা ও দাওয়াতী কর্মকাণ্ডে পিছিয়ে থাকার কারণ।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর জাতির পক্ষ থেকে যেদিন সবচেয়ে কষ্ট পেয়েছিলেন সেই দিনে তাঁর দূরদৃষ্টি ও উচ্চাশার দিকে দৃষ্টিপাত কর। তিনি তায়েফের লোকদেরকে আল্লাহ্‌র দিকে ডাকলে তারা তাঁর দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করে এবং যুবকদেরকে তার পিছনে লেলিয়ে দেয়। যখন তিনি 'কারনুল মানাযিল' নামক স্থানে পৌঁছলেন তখন জিবরীল (আঃ) তাঁকে ডেকে বললেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা আপনার সম্প্রদায়ের কথা ও তাদের প্রত্যুত্তর শ্রবণ করেছেন। তিনি আপনার কাছে পাহাড়ের দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতা পাঠিয়েছেন যাতে তাদের ব্যাপারে আপনি যা করতে চান সে বিষয়ে তাঁকে নির্দেশ দিতে পারেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, فَنَادَانِىْ مَلَكُ الْجِبَالِ فَسَلَّمَ عَلَىَّ ثُمَّ قَالَ : يَا مُحَمَّدُ، ذَلِكَ فِيْمَا شِئْتَ، إِنْ شِئْتَ أَنْ أُطْبِقَ عَلَيْهِمِ الْأَخْشَبَيْنِ. 'অতঃপর পাহাড়ের দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতা আমাকে ডেকে সালাম দিয়ে বললেন, হে মুহাম্মাদ! আপনি চাইলে আমি তাদের উপর মক্কার দু'টি পাহাড় (আবূ কুবাইস ও কাঈকা'আন) চাপিয়ে তাদেরকে পিষে মারব। উত্তরে তিনি বললেন, بَلْ أَرْجُوْ أَنْ يُخْرِجَ اللهُ مِنْ أَصْلاَبِهِمْ مَنْ يَّعْبُدُ اللهَ وَحْدَهُ لاَيُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا. 'বরং আমি আশা পোষণ করি যে, আল্লাহ তাদের বংশ থেকে এমন সন্তান জন্ম দিবেন যে, যারা এক আল্লাহ্‌র ইবাদত করবে এবং তার সাথে কাউকে শরীক করবে না'।[৫৯]

[৫৯]. বুখারী, হাদীছ নং-৩২৩১, 'সৃষ্টির সূচনা' অধ্যায়; মুসলিম, হাদীছ নং-১৭৯৫, 'জিহাদ ও সিয়ার' অধ্যায়, 'মুশরিক ও মুনাফিকদের পক্ষ থেকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দুঃখ-কষ্ট ভোগ' অনুচ্ছেদ।

চতুর্দশ মূলনীতি
শাসকগোষ্ঠীর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা
(الاتصال بولاة الأمر)

শাসকগোষ্ঠী তথা রাষ্ট্রপ্রধান, বিচারক, মন্ত্রণালয়ের লোকজন ও রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ পদে সমাসীন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সাথে আমাদের যোগাযোগ রক্ষা করে চলা উচিত। তাদের সাথে কঠোরতা অবলম্বন করা এবং একথা মনে করা ঠিক নয় যে, আমরা এক গ্রহের বাসিন্দা আর তারা অন্য গ্রহের বাসিন্দা। যখন আমাদের মনে এ চিন্তা ভর করবে তখন সংস্কার হবে দুঃসাধ্য। তাই হকের দোরগোড়ায় পৌঁছার জন্য আমাদেরকে বিনয়ী হতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, فَإِنَّ مَنْ تَوَاضَعَ لِلَّهِ رَفَعَهُ 'যে কেউ আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য বিনীত হলে তিনি তার মর্যাদা বাড়িয়ে দেন'।[৬০]

শাসকগোষ্ঠী, বিচারক ও মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত উচ্চপদস্থ লোকদের সাথে যখন আমাদের যোগাযোগ থাকবে এবং আমাদের ও তাদের মাঝে চমৎকার বোঝাপড়া সৃষ্টি হবে, তখন ইনশাআল্লাহ ফলাফল হবে ভাল।

আল্লাহ্‌র কাছে আমাদের বিনীত প্রার্থনা, তিনি যেন আমাদের অন্তরকে একত্রিত করেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কাছে বিধান গ্রহণের মানসিকতা সৃষ্টি করেন, আমাদের নিয়তকে পরিশুদ্ধ করেন এবং তাঁর শরী'আতের যেসব বিষয় আমাদের কাছে দুর্বোধ্য ঠেকে তা যেন আমাদের জন্য স্পষ্ট করে দেন। তিনি মহৎ ও দানশীল। যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য। দরূদ ও সালাম বর্ষিত হৌক আমাদের নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ), তাঁর বংশধর ও ছাহাবীগণের উপর।

[৬০]. মুসলিম, হাদীছ নং-২৫৮৮, 'সদ্ব্যবহার, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা ও শিষ্টাচার' অধ্যায়, 'ক্ষমা ও বিনয়ের ফযীলত' অনুচ্ছেদ।

ইসলামী পুনর্জাগরণ সম্পর্কিত ১৫টি প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন-১ : আল্লাহ্‌র দিকে দাওয়াত দেয়া কি প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর ওপর ওয়াজিব, নাকি আলেম ও ছাত্রদের জন্য নির্দিষ্ট? সাধারণ লোক কি আল্লাহ্‌র পথে দাওয়াত দিতে পারে?

উত্তর : মানুষ যদি আহূত বিষয়ে জাগ্রত জ্ঞানের অধিকারী হয় তাহলে সে বড় আলেম হোক বা জ্ঞানান্বেষণে আগ্রহী ছাত্র হোক বা সাধারণ লোক হোক- তাতে কোন যায় আসে না। তবে শর্ত হল তাকে নিশ্চিতভাবে বিষয়টি জানতে হবে। কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'একটিমাত্র আয়াত হলেও আমার পক্ষ থেকে পৌঁছিয়ে দাও'।[৬১] দাঈ হওয়ার জন্য অনেক জানা শর্ত নয়; বরং আহূত বিষয়ে অবগতি থাকা শর্ত। কিন্তু না জেনে শুধু আবেগের বশবর্তী হয়ে দাওয়াত দেয়া জায়েয নয়।

স্বল্প জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তিরা শুধুমাত্র প্রচণ্ড আবেগের দ্বারা পরিচালিত হয়ে আল্লাহ্‌র পথে দাওয়াত দেয়ার ফলে আমরা লক্ষ্য করি যে, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য যা হারাম করেননি তারা সেটিকে হারাম সাব্যস্ত করে এবং যা আবশ্যক করেননি, সেটিকে তারা আবশ্যক করে দেয়। এটা খুবই বিপজ্জনক ব্যাপার। কারণ আল্লাহ যা হালাল করেছেন তা হারাম করা, আল্লাহ কর্তৃক হারামকৃত বিষয়কে হালাল করার শামিল। যদি তারা অন্যদের হালালকৃত বিষয়কে অস্বীকার করে তাহলে অন্যরাও তাদের হারামকৃত বিষয়কে অস্বীকার করবে। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَلاَ تَقُوْلُوْا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَـــذَا حَلاَلٌ وَهَـــذَا حَـــرَامٌ لِّتَفْتَرُوْا عَلَى اللهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُوْنَ- مَتَاعٌ قَلِيْلٌ وَلَهُمْ عَـــذَابٌ أَلِـــيْمٌ. 'তোমাদের জিহ্বা মিথ্যা আরোপ করে বলে আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা আরোপ করার জন্য তোমরা বল না, 'এটি হালাল এবং ওটি হারাম'। নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন করবে তারা সফলকাম হবে না। তাদের সুখ-সম্ভোগ সামান্যই এবং তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি' *(নাহল ১১৬-১১৭)*।

পক্ষান্তরে সাধারণ মানুষ (আহূত বিষয়ে) না জেনে দাওয়াত দিবে না। তাকে প্রথমে অবশ্যই জ্ঞানার্জন করতে হবে। আল্লাহ বলেন, قُلْ هَـــذِهِ سَبِيْلِيْ أَدْعُوْ إِلَى اللهِ عَلَى

[৬১]. বুখারী, হাদীছ নং-৩৪৬১।

بَـــصِيْرَةٍ. 'বলুন! এটিই আমার পথ। আমি মানুষকে জাগ্রত জ্ঞান সহকারে আল্লাহ্‌র পথে আহ্বান করি' *(ইউসুফ ১০৮)*। কাজেই অবশ্যই জাগ্রত জ্ঞান সহকারে আল্লাহ্‌র পথে দাওয়াত দিতে হবে। তবে স্পষ্ট খারাপ কাজ থেকে অবশ্যই নিষেধ করবে এবং স্পষ্ট ভাল কাজের ব্যাপারে আদেশ দিবে। পক্ষান্তরে দাওয়াত দেয়ার পূর্বে অবশ্যই জ্ঞানার্জন করতে হবে। কেননা যে না জেনে দাওয়াত দেয় সে সংস্কারের চেয়ে ক্ষতিই করে বেশি। যা আমাদের নিকট সুস্পষ্ট। কাজেই মানুষ প্রথমত জ্ঞানার্জন করবে অতঃপর দাওয়াত দিবে। তবে সুস্পষ্ট খারাপ কাজ থেকে নিষেধ করতে হবে এবং সুস্পষ্ট ভাল কাজের আদেশ দিতে হবে।

প্রশ্ন-২ : মাদরাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শারঈ জ্ঞান শিক্ষাদান করার জন্য শিক্ষকরা বেতন পেয়ে থাকেন। এমতাবস্থায় এটি কি আল্লাহ্‌র পথে দাওয়াত বলে গণ্য হবে?

উত্তর : শারঈ জ্ঞান শিক্ষা দেয়া ভাল কাজ এবং জ্ঞান আহরণের মাধ্যম- এতে কোন সন্দেহ নেই। তবে তা আল্লাহ্‌র পথে দাওয়াত হওয়ার বিষয়টি নির্ভর করে শিক্ষকের মানসিকতার উপর। শিক্ষক যদি ছাত্রদের মাঝে তার উপস্থিতিকে কল্যাণের পথে দিকনির্দেশনা প্রদানের সুবর্ণ সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করেন এবং তার আমলে অনুপম আদর্শ হন, তাহলে তা আল্লাহ্‌র পথে দাওয়াত বলে গণ্য হবে।

আর যদি তিনি ছাত্রদের নিকট তত্ত্ব (Theory) হিসেবে শুধু নীরস-নিষ্প্রাণ দরস পড়ে ব্যাখ্যা করেন, তাহলে অনেক সময় হয়ত তা আল্লাহ্‌র পথে দাওয়াত বলে গণ্য হবে না। শিক্ষক যদি প্রথম প্রকারের হন তাহলে তিনি 'দাঈ ইলাল্লাহ' (আল্লাহ্‌র পথের আহ্বায়ক) হিসেবে বিবেচিত হবেন। যদি এজন্য তিনি বায়তুল মাল বা রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে রিযিক স্বরূপ বেতন গ্রহণ করেন তাতে কোন দোষ নেই।

অনেক মানুষ বক্তৃতা দেয়ার পূর্বেই তার বাহ্যিক অবস্থা দ্বারা আল্লাহ্‌র দিকে দাওয়াত দিয়ে থাকে। অর্থাৎ অনেক ছাত্রের মধ্যে ইলম ও ইবাদতের চিহ্ন দেখতে পাবে । ফলে অন্যের কথায় প্রভাবিত হওয়ার চেয়ে ঐ ছাত্রের ইলম ও ইবাদত তথা আমল দেখেই মানুষ তার বেশি অনুসরণ করে ।

প্রশ্ন-৩ : অধিকাংশ মুসলিম দেশে বিস্তৃত খারাপ কাজ প্রতিরোধের পদ্ধতির ব্যাপারে যুবকদের মাঝে দ্বিধাদ্বন্দ্ব রয়েছে। তারা কি কঠোরতার সাথে তা প্রতিরোধ করবে, যেমনটি কতিপয় যুবক করে থাকে। নাকি অন্য কোন পদ্ধতিতে প্রতিরোধ করবে? যেসব মুসলিম দেশে পরিপূর্ণভাবে ইসলামী শরী'আহ বাস্তবায়িত হয়নি সেখানে তারা এর সদুত্তর পায় না। এ সকল যুবকের ব্যাপারে আপনার সুচিন্তিত অভিমত কি?

উত্তর : আমার মতে প্রথমত আকীদা, আমল ও আখলাক সহ ইসলামের প্রকৃত রূপকে (জনগণের সামনে) তুলে ধরা তাদের কর্তব্য এবং এমন আক্রমণাত্মক ভূমিকা পালন করা উচিত নয়, যা তাদের থেকে মানুষের দূরে সরে যাওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যদি ইসলামকে সঠিকভাবে উপস্থাপন করা হয় তাহলে যাই হোক না কেন, মানুষের সহজাত প্রকৃতি তাকে সানন্দে গ্রহণ করবে। কারণ ইসলাম ধর্ম সুস্থ ফিতরাতের অনুকূল। পক্ষান্তরে মানুষ প্রাচীন যুগ থেকে যে ধ্যান-ধারণার উপর রয়েছে এবং যে ধ্যান-ধারণা তার বাপ-দাদারা পোষণ করত, সে বিষয়ে আক্রমণাত্মক ভূমিকা পালন করলে হকের দাওয়াত থেকে তারা দূরে সরে যাবে এবং তা অপছন্দ করবে। এজন্য আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَلاَ تَسُبُّوا الَّـــذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ فَيَسُبُّوا اللهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُـــلِّ أُمَّـــةٍ عَمَلَهُـــمْ. 'আল্লাহকে ছাড়া যাদেরকে তারা ডাকে তাদেরকে তোমরা গালি দিও না। কেননা তারা সীমালংঘন করে অজ্ঞানতাবশত আল্লাহকেও গালি দিবে। এভাবে আমি প্রত্যেক জাতির দৃষ্টিতে তাদের কার্যকলাপ সুশোভন করেছি' *(আন'আম ১০৮)*।

কাজেই এ ধরনের সমাজে দাওয়াতী কাজে রত ভাইদের প্রতি আমার নছীহত হচ্ছে, তাদের আমলের ব্যাপারে সরাসরি আক্রমণ না করে তারা যতটুকু সত্য ও যতটুকু মিথ্যার উপর রয়েছে, ততটুকু তাদের সামনে প্রকাশের ব্যাপারে আগ্রহী হওয়া।

প্রশ্ন-৪ : বর্তমান যুগের প্রেক্ষিতে সঠিক শারঈ জ্ঞান অর্জনের সবচেয়ে সুন্দর পদ্ধতি কোনটি?

উত্তর : নিঃসন্দেহে সবচেয়ে সুন্দর পদ্ধতি হচ্ছে- মানুষ কুরআন মাজীদ দ্বারা শুরু করবে অতঃপর সাধ্যানুযায়ী রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছহীহ হাদীছ অধ্যয়ন করবে। তারপর ফকীহ ও অন্যরা যা লিপিবদ্ধ করেছেন তা পড়বে। তবে ছাত্রদের জন্য যে বিষয়টি আমি পছন্দ করি তা হল, মূলনীতির প্রতি তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকবে; হাশিয়া বা পার্শ্বটীকার প্রতি নয়। অর্থাৎ শুধু কতিপয় মাসআলা মুখস্থ করা যেন ছাত্রদের অভিপ্রায় না হয়; বরং তাদের অভিপ্রায় হবে মূলনীতি ও নিয়ম-নীতি (الأصول والقواعد والضوابط) মুখস্থ করা। যাতে তার নিকট কোন খণ্ড মাসআলা আসলে সে সেটিকে এ মূলনীতির আলোকে বিচার করতে পারে। কেননা ওলামায়ে কেরাম বলেছেন, من حُرِمَ الأصولُ حُرِمَ الوصولُ 'যে মূলনীতি থেকে বঞ্চিত হয়, সে ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছতে সক্ষম হয় না'। অনেক ছাত্রকে তুমি দেখবে, তার মাথায় খণ্ড মাসআলা গিজগিজ করছে। কিন্তু তুমি যদি তাথেকে আঙ্গুল পরিমাণ বের হয়ে যাও, তাহলে সে কিছুই বুঝতে পারে না। কারণ সে মূলনীতি জানে না।

কাজেই যেসব মূলনীতির উপর খণ্ড মাসআলা ভিত্তিশীল ছাত্রদের সেগুলো সম্পর্কে অবগতি থাকা আবশ্যক।

ছাত্রজীবনে আমরা শুনেছিলাম, এক ছাত্র না বুঝেই শুধু মুখস্থ করত। সে ইমাম আহমাদ বিন হাম্বলের মাযহাবের 'আল-ফুরূ' (الفروع) গ্রন্থটি মুখস্থ করেছিল। এটি হাম্বলী মাযহাবের একটি সারগর্ভ গ্রন্থ। এতে চার মাযহাব ছাড়াও অন্য মাযহাবগুলোর দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়া (রহঃ)-এর খ্যাতিমান ছাত্র মুহাম্মাদ বিন মুফলিহ এটি রচনা করেন। তিনি শায়খুল ইসলাম-এর ফিকহী সিদ্ধান্ত সম্পর্কে খুবই অবগত ছিলেন। এমনকি ইবনুল কাইয়িম (রহঃ) পর্যন্ত শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তায়মিয়ার ফিকহী মতামত তার কাছ থেকে জেনে নিতেন।

মোদ্দাকথা, তিনি 'আল-ফুরূ' গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন এবং এক ছাত্র সেটি সম্পূর্ণ মুখস্থ করেছিল। কিন্তু সে এই গ্রন্থের কোন অংশের অর্থই বুঝত না। ছাত্ররা কোন ফিকহী সমস্যায় পড়লে তাকে জিজ্ঞেস করত, অমুক পরিচ্ছেদে বা অনুচ্ছেদে ইবনু মুফলিহ কি বলেছেন? তখন সে সেই বই থেকে হড়হড় করে উদ্ধৃতি পেশ করত। কিন্তু সেসবের অর্থ জানত না। কাজেই উছূলে ফিকহ বা ফিকহের মূলনীতি ও অর্থ জানা ছাত্রদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

প্রশ্ন-৫ : বর্তমান যুগে মিডিয়া প্রভাব বিস্তারকারী ভূমিকা পালন করছে। টেলিভিশনের মাধ্যমে এমন অনেক কিছু প্রচার করা যায় যা হয়ত অন্য মাধ্যমে সম্ভব নয়, কাজেই (দাওয়াতী কাজে) একে ব্যবহার করা উচিত। এ ব্যাপারে আপনার মতামত কি? যারা বলে, গণমাধ্যম খারাপ অনুষ্ঠান প্রচার করে হেতু তাতে অংশগ্রহণ করা জায়েয নয়। উপরন্তু এতে অংশগ্রহণ করা ঐসব গর্হিত বিষয়কে স্বীকৃতি দেয়ার শামিল। এ সম্পর্কে আপনার অভিমত কি?

উত্তর : আমি মনে করি, আল্লাহ্র দিকে দাওয়াত দেয়ার জন্য মিডিয়াকে কাজে লাগানো উচিত। কেননা এর মাধ্যমে দলীল প্রতিষ্ঠিত হয়। আমার মতে মিডিয়াকে আল্লাহ্র দিকে দাওয়াত দেয়ার ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে ব্যবহার করা যায়। আমরা এটিকে তাওহীদ, আল্লাহ্র নাম ও গুণাবলী সম্পর্কিত আকীদা ও একমাত্র আল্লাহ্র জন্য ইবাদত করার দিকে আহ্বানের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করতে পারি। এক্ষেত্রে কেউ যেন শাসক বা তার চেয়ে বড় ব্যক্তিকে লাঞ্ছিত করা বা এরূপ অন্য কোন উদ্দেশ্য না রাখে। তাছাড়া ফিকহ যেমন ইবাদত এবং মু'আমালাত যেমন বিবাহ-শাদী ও অন্যান্য বিষয় প্রচারের ভিত্তি হিসেবেও আমরা মিডিয়াকে ব্যবহার করতে পারি। অর্থাৎ দাওয়াতের বিষয় হবে ব্যাপক।

এসব বিষয়ে মিডিয়াতে এমন বিস্তারিত আলোচনা যেন না করা হয়, যাতে পাঠক বা দর্শকের বিরক্তির উদ্রেক হতে পারে। বরং যতটুকু উপস্থাপন করলে মানুষের বিরক্তির কারণ ঘটবে না ঠিক ততটুকু পেশ করা উচিত। এর মাধ্যমে মানুষেরা ব্যাপকভাবে উপকৃত হতে পারে। শর্ত হল, মানুষকে পথভ্রষ্টকারী, তাদের চরিত্র বিধ্বংসী বা অনুরূপ গর্হিত বিষয় যেন আলোচনার বিষয়বস্তু না হয় সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। তবে আমি এও মনে করি যে, এসব মাধ্যমকে এড়িয়ে চলা ও তাতে অংশগ্রহণ না করা যদি গর্হিত কাজ পরহেয করার কারণ হয়, তাহলে সেই গর্হিত কাজ পরিত্যাগ না করা পর্যন্ত সেসব মিডিয়াকে এড়িয়ে চলা ও পরিহার করা আবশ্যক। অতঃপর যা কল্যাণকর তার দ্বার খুলে যাবে।

আর যদি এতে কাজ না হয় এবং বড় ধরনের খারাপ অনুষ্ঠান প্রচারের আধিক্যের কারণে চূড়ান্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, তাহলে আমার মতে এই সুযোগ গ্রহণ করা এবং এ সকল মিডিয়ার মাধ্যমে দাওয়াত প্রচার করা আবশ্যক। তাছাড়া প্রশ্নকারীর বক্তব্য অনুযায়ী বুঝা যায় যে, আপনার ভাল কথা উপস্থাপনের সময় খারাপ অনুষ্ঠান সম্প্রচারিত হয় না। বরং এটি তা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক অনুষ্ঠান। ফলে যে কল্যাণ চায় সে সেই অনুষ্ঠান শ্রবণ করল ও দেখল। আর যখন খারাপ অনুষ্ঠান প্রচারের সময় হল তখন রেডিও বা টেলিভিশন বন্ধ করে অনুষ্ঠান দেখা শেষ করল।

প্রশ্ন-৬ : ইসলামী ক্যাসেট আল্লাহ্‌র পথে দাওয়াতের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যমে পরিণত হয়েছে। বক্তব্য কিভাবে রেকর্ড করা উচিৎ বলে সম্মানিত শায়খ মনে করেন? ক্যাসেট সরবরাহকারীদের প্রতি আপনার কোন নছীহত আছে কি?

উত্তর : ইসলামী ক্যাসেট সংরক্ষণ করা ও এ ব্যাপারে যত্নবান হওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে আমি মনে করি। কারণ এতে প্রভূত উপকার রয়েছে। যে ভাইয়েরা এই অঙ্গনে কাজ করেন তাদের প্রতি আমার নছীহত, শুধু পরিমাণ নয়, গুণগত মানের প্রতিও তারা যেন লক্ষ্য রাখেন। কেননা কিছু ক্যাসেটে যাচ্ছেতাই বক্তব্য রয়েছে। এসব ক্যাসেটে অনেক বক্তার মন বিগলিতকারী বক্তব্য রয়েছে। এতে দোষের কিছু নেই। কিন্তু মুশকিল হল সেগুলোতে যঈফ ও জাল হাদীছ রয়েছে। ফলে কয়েক মিনিটের জন্য বক্তব্য শুনে শ্রোতার মন বিগলিত হওয়ার চেয়ে তাতে ক্ষতিই বেশি হয়। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নামে জালকৃত হাদীছ শ্রোতার মনে প্রোথিত হয়ে যায় এবং পরে তা থেকে বেরিয়ে আসা বেশ কষ্টকর হয়।

ইসলামী ক্যাসেট সরবরাহকারীদের এ দিকটার প্রতি খেয়াল রাখা এবং এ কথা জানা উচিত যে, তাদের প্রচারিত ক্যাসেটের ফলে মুসলমানদের আকীদা ও আখলাকে যদি সামান্যতম খাদ সৃষ্টি হয়, তাহলে তারা (পরকালে) আল্লাহ্‌র কাছে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে। মানুষ যেন পথচ্যুত না হয় সেজন্য এ ব্যাপারে গুরুত্ব

প্রদান করা আবশ্যক। কারণ সাধারণ মানুষ যখন ক্রন্দনোদ্দীপক ও মনগলানো ক্যাসেট শুনে, তখন তার প্রতি আকর্ষিত হয় এবং তাদের মন-মগজে এই সমস্ত বাতিল তথ্য স্থায়ী আসন গেড়ে বসে। এটা অত্যন্ত মারাত্মক ব্যাপার।

প্রশ্ন-৭ : কুরআন মাজীদের পরে দাঈগণ আর কোন্ কোন্ গ্রন্থ অধ্যয়ন করবেন?

উত্তর : পড়া, শেখা ও আমল করার জন্য কুরআন মাজীদের প্রতি মানুষের সবচেয়ে বেশি মনোযোগ দেয়া উচিত। ছাহাবীগণ (রাঃ) কুরআন মাজীদের দশটি আয়াত ততক্ষণ অতিক্রম করে যেতেন না, যতক্ষণ না তার মধ্যে লুক্কায়িত জ্ঞান অর্জন করতেন এবং তার প্রতি আমল করতেন। সুতরাং আপনারা কুরআন মাজীদ অধ্যয়ন, জ্ঞান অর্জন ও আমল সবই একসাথে শিখুন! অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছহীহ হাদীছ ও বিদ্বানদের রচিত উহার ব্যাখ্যাগ্রন্থ সমূহ যেমন- ফাতহুল বারী, নায়লুল আওতার, সুবুলুস সালাম প্রভৃতি অধ্যয়ন করুন! তারপর শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়া, তার ছাত্র ইবনুল কাইয়িম, শায়খুল ইসলাম মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব এবং অন্যান্য গভীর মনীষার অধিকারী আল্লাহভীরু আলেমগণের রচিত গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন করুন! মোদ্দাকথা, মানুষ জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা রক্ষা করে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে প্রাধান্য দিবে।

প্রশ্ন-৮ : মৃত ব্যক্তিকে দাফন করার সময় কবরের নিকট ওয়ায করার যে প্রবণতা বর্তমানে লক্ষ্য করা যাচ্ছে, সে ব্যাপারে আপনার মত কি?

উত্তর : কবরের নিকট ওয়ায করা আমি শরী'আতসম্মত মনে করি না। এটিকে স্থায়ী সুন্নাত হিসেবে গ্রহণ করাও উচিত নয়। এরূপ করার যুক্তিসংগত কোন কারণ থাকলে তা শরী'আতসম্মত হবে। যেমন- দাফনের সময় গোরস্থানে লোকদেরকে হাসি-ঠাট্টা করতে দেখলে তাদেরকে নছীহত করা নিঃসন্দেহে ভাল কাজ। কারণ এমনটি করার যুক্তিসংগত কারণ পাওয়া গেছে। তবে মৃত ব্যক্তিকে দাফন করার সময় কোন ব্যক্তি মানুষের মাঝে বাগ্মীরূপে দাঁড়িয়ে বক্তব্য দিবে, এমনটি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জীবনাদর্শে পরিদৃষ্ট হয় না। আর এরূপ করাও উচিত নয়।

হ্যাঁ, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এক আনছার ছাহাবীর জানাযায় গিয়ে উপস্থিত হন। তখনও কবর খোঁড়া হয়নি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সেখানে বসলেন এবং তাঁর আশপাশে ছাহাবায়ে কেরাম ভয় ও শ্রদ্ধার সাথে পিন-পতন-নীরবতা অবলম্বন করে বসেছিলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর হাতে থাকা লাঠি দ্বারা মাটিতে দাগ কাটছিলেন আর মৃত্যু ও তৎপরবর্তী সময়ে ঐ ব্যক্তির অবস্থা বর্ণনা করছিলেন।[৬২] এ হাদীছ

[৬২]. মুসনাদে আহমাদ ৪/২৮৪; আবূ দাঊদ, হাদীছ নং-৪৭৫৩, 'সুন্নাহ' অধ্যায়, 'কবরে জিজ্ঞাসাবাদ ও কবর আযাব' অনুচ্ছেদ, হাদীছটি ছহীহ।

থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছাহাবীগণের মাঝে বাগ্মীরূপে ওয়ায করেছিলেন এমনটি নয়; বরং তিনি বসেছিলেন এবং তাঁর চতুষ্পার্শ্বে ছাহাবীগণ পরিবেষ্টন করে কবর খোঁড়া শেষ হওয়ার অপেক্ষা করছিলেন। এই সময় তিনি তাদের সাথে কথা বলছিলেন। যেমন আপনি ও আপনার বন্ধুরা মৃত ব্যক্তির দাফনের অপেক্ষায় থাকা অবস্থায় তাদের সাথে এ বিষয়ে আলোচনা করলেন। বন্ধুদের মধ্যে আলোচনা আর খুৎবা বা বক্তব্যের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। অনুরূপভাবে মৃত ব্যক্তির দাফন শেষ হলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কবরে দাঁড়িয়ে বলতেন, اِسْتَغْفِرُوْا لِأَخِيْكُمْ. وَاسْأَلُوْا لَهُ بِالتَّثْبِيْتِ، فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ 'তোমরা তোমাদের ভাইয়ের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং ঈমানের ওপর তার দৃঢ় থাকার জন্য দু'আ কর। কেননা এখনই সে জিজ্ঞাসিত হচ্ছে'।[৬৩] এটিও একটি বিশেষ মাসআলা। এটি খুৎবা বা বক্তৃতা নয়।

প্রশ্ন-৯ : মহিলাদের উপর দাওয়াত দেয়া কি ওয়াজিব? তারা কোন পরিসরে দাওয়াত দিবে?

উত্তর : আমাদের একটি নিয়ম জানা উচিত। তা হল- পুরুষের জন্য যে বিধান প্রযোজ্য, নারীর জন্যও সে বিধান প্রযোজ্য। আর নারীর জন্য যে বিধান প্রযোজ্য, তা পুরুষের জন্যও প্রযোজ্য। যদি এর বিপরীত দলীল পাওয়া যায় তবে ভিন্ন কথা।

পুরুষের জন্য নির্দিষ্ট বিষয়ের দলীল হল- আয়েশা (রাঃ) বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! মহিলাদের উপর কি জিহাদ ফরয? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, نَعَمْ، عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لاَ قِتَالَ فِيْهِ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ. 'হ্যাঁ, তাদের জন্য এমন জিহাদ ফরয, যাতে কোন লড়াই নেই। আর তা হল হজ্জ ও ওমরা'।[৬৪] এ হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল যে, শত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদ করা পুরুষদের জন্য ওয়াজিব, মহিলাদের জন্য নয়। অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, خَيْرُ صُفُوْفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا، وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوْفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا 'পুরুষদের সবচেয়ে উত্তম কাতার হল প্রথম কাতার আর সবচেয়ে নিকৃষ্ট কাতার হল শেষের কাতার। আর মহিলাদের সবচেয়ে উত্তম কাতার

[৬৩]. আবূ দাউদ, হাদীছ নং-৩২২১, 'জানাযা' অধ্যায়, 'মৃত ব্যক্তির জন্য কবরের নিকটে দাঁড়িয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করা' অনুচ্ছেদ, হাদীছটি ছহীহ।

[৬৪]. মুসনাদে আহমাদ ৬/১৬৫; ইবনু মাজাহ, হাদীছ নং-২৯০১, 'হজ্জ' অধ্যায়, 'মহিলাদের জিহাদ হল হজ্জ' অনুচ্ছেদ; সুনানে দারাকুতনী ২/২৮৪, হাদীছটি ছহীহ।

হল শেষ কাতার আর সবচেয়ে নিকৃষ্ট কাতার হল প্রথম কাতার'।[৬৫] পক্ষান্তরে মহিলাদের জন্য নির্দিষ্ট বিষয়ের দলীল হল স্বর্ণ ব্যবহার করা ও রেশমী কাপড় পরিধান করা। কেননা এটি নারীদের জন্য খাছ বা নির্দিষ্ট।

মোটকথা মূলনীতি হল, আদেশ-নিষেধের ব্যাপারে পুরুষের জন্য যা প্রযোজ্য, নারীর জন্যও তাই প্রযোজ্য। আর নারীর জন্য যা প্রযোজ্য, তা পুরুষের জন্যও প্রযোজ্য। এজন্য কেউ যদি কোন পুরুষকে ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদ দেয় তাহলে তাকে আশিটি বেত্রাঘাত করতে হবে। অথচ এ সম্পর্কিত আয়াতে সতী-সাধ্বী অবলা নারীদের কথা বলা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوْا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمَانِيْنَ جَلْـــدَةً. 'যারা সাধ্বী রমণীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে এবং চারজন সাক্ষী উপস্থিত করে না, তাদেরকে আশিটি বেত্রাঘাত করবে' *(নূর ৪)*।

এক্ষণে আমরা আল্লাহ্‌র পথে দাওয়াত পুরুষদের জন্য নির্দিষ্ট, নাকি নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য প্রযোজ্য- সে বিষয়ে ফিরে আসি। কুরআন মাজীদ ও ছহীহ হাদীছ থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, এটি উভয়ের জন্য প্রযোজ্য। তবে নারী ও পুরুষের দাওয়াতের ক্ষেত্র ভিন্ন। মহিলারা নারী সমাজে আল্লাহ্‌র দিকে দাওয়াত দিবে; পুরুষ সমাজে নয়। যে পরিবেশ ও পরিসরে দাওয়াত দেয়া নারীর পক্ষে সম্ভব, সেখানে সে দাওয়াত দিবে। আর তা হল নারী সমাজ- মাদরাসায় হোক বা মসজিদে হোক।

প্রশ্ন-১০ : কোন মুসলিম কোন কাফেরকে দাওয়াত দেয়ার সময় কোন বিষয় দ্বারা শুরু করবে?

উত্তর : অনেকেই আল্লাহ্‌র পথে দাওয়াত, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ এবং অন্যায় কাজ প্রতিরোধের মধ্যে পার্থক্য করে না। প্রকৃতপক্ষে এগুলোর বিভিন্ন স্তর ও পার্থক্য রয়েছে।

আল্লাহ্‌র পথে দাওয়াত দুই প্রকার– সাধারণ ও বিশেষ। আপামর জনসাধারণের জন্য বক্তব্য প্রদান ও বই লেখা সাধারণ দাওয়াত। আর বিশেষ দাওয়াত হল একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে আল্লাহ্‌র পথে দাওয়াত দেয়ার জন্য তার নিকট যাওয়া। এটা শুধু কাফেরের জন্য নির্দিষ্ট নয়; বরং মুসলিম ব্যক্তিও দাওয়াতের মুখাপেক্ষী। অনেক সময় আমরা কোন মুসলিমকে কোন কাবীরা গুনাহের ব্যাপারে গোঁ ধরতে দেখি। সে সত্যের উপর রয়েছে বলে ধারণা করে অথবা সে ঐ বিষয়টি হারাম হওয়ার ব্যাপারে সন্দিগ্ধ। এরূপ ব্যক্তিকে দাওয়াত দেয়ার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

[৬৫]. মুসলিম, হাদীছ নং-৪৪০, 'ছালাত' অধ্যায়, 'কাতার সোজা করা' অনুচ্ছেদ।

দাঈ তার নিকট গিয়ে হক বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করবে এবং তার জন্য দৃষ্টান্ত পেশ করবে, যাতে সে পরিতুষ্ট হয়। এটি সৎ কাজের আদেশ (الأمــــر) দেয়ার অন্তর্ভুক্ত নয়। পক্ষান্তরে আদেশ প্রদানকারী দাঈর চেয়ে ক্ষমতাধর। কারণ আমরা জানি যে, أمر হচ্ছে 'নিজেকে বড় মনে করে কাউকে কোন কাজের আদেশ দেয়া' (طلب الفعل على وجه الاستعلاء)। কাজেই আদেশ প্রদানের মধ্যে ক্ষমতার ভাব থাকে। কিন্তু দাঈ দাওয়াত পেশকারী। তিনি (মানুষকে) উৎসাহিত করেন মাত্র। কিন্তু আদেশ প্রদানকারীর এক প্রকার ক্ষমতা থাকে।

যদি আপনি আপনার কোন বন্ধু বা সাথীকে কোন বিষয়ে আদেশ দেন তাহলে তাকে বলা হয় التماس বা অনুরোধ; নির্দেশ নয়। কিন্তু আপনি আপনার চেয়ে ছোট কাউকে নির্দেশ দিলে সেটি أمر হবে। অন্যদিকে প্রতিরোধকারীর ক্ষমতা নির্দেশ প্রদানকারীর চেয়ে বেশি। কারণ সে নিজ হাতে অসৎ কাজকে প্রতিরোধ করার ক্ষমতা রাখে। এজন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ. 'তোমাদের মধ্যে কেউ যদি কোন গর্হিত কাজ হতে দেখে, তাহলে সে যেন তা হাত দ্বারা বাধা দেয়। যদি সক্ষম না হয় তাহলে যবান দ্বারা। আর যদি তাও সক্ষম না হয় তাহলে অন্তর দ্বারা ঘৃণা করবে'।[৬৬] পক্ষান্তরে আদেশ দেয়ার ক্ষেত্রে এরূপ ধারাবাহিকতা অবলম্বন করে বলা হয়নি যে, তোমাদের মধ্যে কেউ যদি কোন কাজের আদেশ দিতে চায় তাহলে সে যেন তার হাত দ্বারা আদেশ দেয় ... ইত্যাদি।

মোদ্দাকথা, কাফেরের কুফরী অনুযায়ী তাকে দাওয়াত দানের পদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন হবে। যারা আল্লাহ্র অস্তিত্বকে অস্বীকার করে যেমন- কমিউনিস্টরা, তাদেরকে আমরা আল্লাহ্র অস্তিত্বের যুক্তিগ্রাহ্য ও অনুধাবনযোগ্য দলীল বর্ণনার দ্বারা আল্লাহ্র পথে দাওয়াত দিব। কারণ শারঈ দলীল দ্বারা তারা পরিতুষ্ট হবে না। তাই আমরা তাদের কাছে আল্লাহ্র অস্তিত্ব ও অস্তিত্বের আবশ্যকতা যুক্তিগ্রাহ্য ও বাস্তব অনুধাবনযোগ্য দলীল দ্বারা বর্ণনা করব। যুক্তিগ্রাহ্য দলীল হচ্ছে আল্লাহর বাণী- أَمْ خُلِقُوْا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُوْنَ. 'তারা কি স্রষ্টা ব্যতীত সৃষ্টি হয়েছে, না তারা নিজেরাই স্রষ্টা' *(তূর ৩৫)*। বদর যুদ্ধের বন্দী জুবাইর বিন মুতঈম (রাঃ) বলেন,

---

৬৬. মুসলিম, হাদীছ নং-৪৯, 'ঈমান' অধ্যায়, 'অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করা ঈমানের অংশ' অনুচ্ছেদ।

'আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে মাগরিবের ছালাতে সূরা তূর পড়তে শুনলাম। যখন তিনি উক্ত আয়াতে পৌঁছলেন তখন আমার অন্তর যেন উড়তে লাগল'।[৬৭] ঐ আয়াতগুলো তার অন্তরে দাগ কাটায় ও অন্তরে ঈমান প্রোথিত হওয়ার কারণে এমনটি হয়েছিল।

এই আয়াতের জবাবে আমরা বলব, তারা স্রষ্টা ব্যতীত সৃষ্টি হয়নি। তাদের অবশ্যই একজন সৃষ্টিকর্তা আছেন। তারা নিজেরা নিজেদেরকে সৃষ্টি করেনি। কারণ তারা অস্তিত্বহীন ছিল। আর অস্তিত্বহীন কোন বস্তু অন্যকে সৃষ্টি করতে পারে না। কারণ সে নিজেই অস্তিত্বহীন। কাজেই তারা নিজেরা নিজেদেরকে সৃষ্টি করতে পারে না এবং তারা স্রষ্টাহীন সৃষ্টিও হয়নি। নিশ্চয়ই তাদের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ।

আর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দলীল হচ্ছে- আমরা সবাই প্রত্যক্ষ করি যে, মানুষ কোন বিষয়ে আল্লাহকে ডাকে। অতঃপর তার দু'আ অনুযায়ী হুবহু সেই বিষয়টি সংঘটিত হয়। কুরআন ও হাদীছে এর অনেক প্রমাণ রয়েছে। বাস্তবেও মানুষের মধ্যে এমনটি ঘটে থাকে। কোন মানুষ যদি আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনার পরেও ইহুদী-নাছারাদের মতো রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর রিসালাতকে অস্বীকার করে, তাহলে আমরা তাদেরকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর রিসালাতের সত্যতা বর্ণনা করে আল্লাহ্র পথে দাওয়াত দিব। বিশেষ করে নাছারাদেরকে আমরা বলব, তোমরা কি ঈসা (আঃ)-এর প্রতি ঈমান রাখ? তারা নিশ্চয়ই বলবে, হ্যাঁ! তোমরা কি তাকে সত্য নবী বলে স্বীকার কর? তারা বলবে, হ্যাঁ! আমরা তাকে সত্য নবী বলে স্বীকার করি। তখন আমরা তাদেরকে বলব, আল্লাহ তা'আলার বাণী শুনো : وَإِذْ قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ إِنِّيْ رَسُوْلُ اللهِ إِلَيْكُم مُّصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّراً بِرَسُوْلٍ يَّأْتِيْ مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوْا هَذَا سِــــحْرٌ مُّبِــــيْنٌ. 'স্মরণ কর, মারয়াম-তনয় ঈসা বলেছিল, হে বনী ইসরাঈল! আমি তোমাদের নিকট আল্লাহ্র রাসূল এবং আমার পূর্ব হতে তোমাদের নিকট যে তাওরাত রয়েছে আমি তার সমর্থক এবং আমার পরে আহমাদ নামে যে রাসূল আসবে আমি তার সুসংবাদদাতা। পরে সে যখন স্পষ্ট নিদর্শনসহ তাদের নিকট আসল তখন তারা বলতে লাগল, এতো এক স্পষ্ট জাদু' *(ছফ ৬)*।

কোন কিছুর সুসংবাদদাতা কি এমন বিষয়ে সুসংবাদ দিতে পারে, যার সাথে সুসংবাদপ্রাপ্তদের কোন সম্পর্ক নেই? এর উত্তরে তারা বলবে, না। তখন আমরা বলব, তাহলে তোমাদের উচিত মুহাম্মাদকে সত্য নবী বলে স্বীকার করা। যদি তারা

---

৬৭. বুখারী, হাদীছ নং-৪৮৫৪, 'তাফসীর' অধ্যায়, 'সূরা তূরের তাফসীর' অনুচ্ছেদ।

বলে, ঈসা আহমাদের ব্যাপারে সুসংবাদ দিয়েছেন। আর তোমরা যে নবীর কথা বলছ তিনি তো মুহাম্মাদ। কাজেই আমরা আহমাদের প্রতীক্ষায় আছি। তখন আমরা তাদের বলব, তোমরা আল্লাহর বাণী فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ 'যখন সে স্পষ্ট নিদর্শনসহ তাদের নিকট আসল' পড়। এখানে جَاءَ শব্দটি অতীতকালের ক্রিয়া। কাজেই যে ব্যক্তি সম্পর্কে সুসংবাদ দেয়া হয়েছে তিনি এ পৃথিবীতে এসেছেন। ঈসা (আঃ)-এর পরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ব্যতীত অন্য কোন নবী এসেছেন কি? কখনো না। যদি তারা বলে, মুহাম্মাদ ব্যতীত অন্য নবী এসেছেন। তখন আমরা বলব, তাহলে তোমরা মুহাম্মাদ (ছাঃ) ব্যতীত যে নবী আসার দাবী করছ তার অনুসরণ কর। কিন্তু তারা এমনটি দাবী করে না।

মোদ্দাকথা আমাদের বক্তব্য হল, আহমাদই মুহাম্মাদ। আল্লাহ তা'আলা ঈসাকে এই নামের (আহমাদ) ব্যাপারে অবগত করেছিলেন তাঁর [মুহাম্মাদ (ছাঃ)] শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য। কেননা أحمد শব্দটি কর্তাবাচক বিশেষ্য (إسم فاعل) থেকে আসুক বা কর্মবাচক বিশেষ্য (إسم مفعول) থেকে আসুক, তা إسم تفضيل বা অগ্রাধিকার বিশেষণ। এটি নবী করীম (ছাঃ)-এর মর্যাদার প্রতি নির্দেশ করে। আর একথার দিকেও ইঙ্গিত করে যে, তিনি মানুষের মধ্যে আল্লাহ্র সবচেয়ে বেশি প্রশংসাকারী এবং মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রশংসা পাওয়ারও যোগ্য। কাজেই 'আহমাদ' নামটি দু'দিক থেকেই إسم تفضيل অর্থাৎ তিনি মানুষের মধ্যে আল্লাহ্র সবচেয়ে বেশি প্রশংসাকারী এবং মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রশংসা পাওয়ারও যোগ্য। (অর্থাৎ তিনি আহমাদ ও মুহাম্মাদ উভয়ই)। অন্য মানুষদের উপর রাসূলুল্লাহর (ছাঃ)-এর শ্রেষ্ঠত্ব বুঝানোর জন্যই বনী ইসরাঈলকে তাঁর আগমনের সুসংবাদ প্রদানের ক্ষেত্রে এই নামটিকে নির্বাচন করা হয়েছে।

প্রশ্ন-১১ : আন্তঃধর্ম বিতর্ক অনুষ্ঠান করা কি জায়েয? যেমনটি দাঈ আহমাদ দীদাত ও খৃষ্টান পাদ্রির মধ্যে সংঘটিত হয়েছে?

উত্তর : প্রয়োজন দেখা দিলে মুসলমান ও কাফেরদের মধ্যে বিতর্ক করা ওয়াজিব। এ ব্যাপারে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর নবীকে নির্দেশ দিয়ে বলেন, قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِّنْ دُوْنِ اللهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوا اشْهَدُوْا بِأَنَّا مُسْلِمُوْنَ. 'তুমি বল, হে আহলে কিতাব! এসো সে কথায় যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে একই; যেন আমরা আল্লাহ ব্যতীত কারো ইবাদত না করি, কোন কিছুকেই তাঁর শরীক না

করি এবং আমাদের কেউ কাউকেও আল্লাহ ব্যতীত রব হিসেবে গ্রহণ না করে। যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে বল, তোমরা সাক্ষী থাক, অবশ্যই আমরা মুসলিম' *(আলে ইমরান ৬৪)*। ইবরাহীম (আঃ)-এর সাথে তদানীন্তন বাদশাহ্ ও তার জাতির বিতর্ক আমাদের অজানা নয়। ইবরাহীম (আঃ)-এর সাথে তাঁর জাতির বিতর্ক সম্পর্কে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন,

فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَباً قَالَ هَـٰذَا رَبِّيْ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لا أُحِبُّ الْآفِلِيْنَ. فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغاً قَالَ هَـٰذَا رَبِّيْ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَّمْ يَهْدِنِيْ رَبِّيْ لأَكُوْنَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّيْنَ. فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَـٰذَا رَبِّيْ هَـٰذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّيْ بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ. إِنِّيْ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيْفاً وَّمَا أَنَاْ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ.

'অতঃপর রাত্রির অন্ধকার যখন তাকে আচ্ছন্ন করল তখন সে নক্ষত্র দেখে বলল, এটাই আমার প্রতিপালক। অতঃপর যখন তা অস্তমিত হল তখন সে বলল, যা অস্ত মিত হয় তা আমি পছন্দ করি না। অতঃপর যখন সে চন্দ্রকে সমুজ্জ্বলরূপে উদিত হতে দেখল তখন বলল, এটাই আমার প্রতিপালক। যখন এটাও অস্তমিত হল তখন বলল, আমাকে আমার প্রতিপালক সৎপথ প্রদর্শন না করলে আমি অবশ্যই পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হব। অতঃপর যখন সে সূর্য দীপ্তিমানরূপে উদিত হতে দেখল তখন বলল, এটা আমার প্রতিপালক, এটা সর্ববৃহৎ। যখন তাও অস্তমিত হল, তখন সে বলল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা যাকে আল্লাহ্র শরীক কর তার সাথে আমার কোন সংশ্রব নেই। আমি একনিষ্ঠভাবে তাঁর দিকে মুখ ফিরাচ্ছি যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই' *(আন'আম ৭৬-৭৯)*।

যেহেতু ধর্ম নিয়েই বিতর্ক সেহেতু মুসলিম তার্কিকের অবশ্যই তার ধর্ম ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে, যাতে সে তার প্রতিপক্ষকে লা জওয়াব করে দিতে পারে। কেননা তার্কিককে দু'টো কাজ করতে হয় :

১. তার কথার দলীল সাব্যস্ত করা।

২. প্রতিপক্ষের দলীল বাতিল প্রমাণ করা।

মুসলিম তার্কিকের নিজের এবং প্রতিপক্ষের ধর্ম সম্পর্কে পূর্ণ অবগতি ছাড়া এটা সম্ভব নয়। যাতে সে প্রতিপক্ষের দলীল খণ্ডন করতে পারে এবং ইসলামের দাঈদের এ সুসংবাদ দিতে পারে যে, বাতিলপন্থীদের দলীল ভ্রান্ত-অমূলক এবং তাদের

বাতিল মতবাদ ধ্বংসযোগ্য। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَالَّذِيْنَ يُحَاجُّوْنَ فِـــي اللهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتُجِيْبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَـــدِيْدٌ. 'আল্লাহকে স্বীকার করার পর যারা আল্লাহ সম্পর্কে বিতর্ক করে তাদের যুক্তি-তর্ক তাদের প্রতিপালকের দৃষ্টিতে অসার এবং তারা তাঁর ক্রোধের পাত্র এবং তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি' *(শূরা ১৬)*। তিনি আরো বলেন, بَلْ نَقْذِفُ بِـــالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُوْنَ. 'বরং আমি সত্য দ্বারা আঘাত হানি মিথ্যার উপর; ফলে উহা মিথ্যাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয় এবং তৎক্ষণাৎ মিথ্যা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। দুর্ভোগ তোমাদের! তোমরা যা বলছ তার জন্য' *(আম্বিয়া ১৮)*।

মুসলিম দাঈ আহমাদ দীদাত ও খৃষ্টান পাদ্রির মাঝে অনুষ্ঠিত বিতর্কের কিছু অংশ আমি দেখেছি। আমার তা বেশ ভাল লেগেছে। আমি অবগত হয়েছি যে, তিনি ঐ পাদ্রির মুখে কুলুপ এঁটে দিয়েছিলেন এবং অবশেষে পাদ্রি তার অক্ষমতা প্রকাশ করে বিতর্ক পরিত্যাগ করেছিলেন। *আল-হামদুলিল্লাহ*।

প্রশ্ন-১২ : কতিপয় ধর্মনিরপেক্ষ ও অন্য মতাদর্শ লালনকারী মুসলিমের পক্ষ থেকে ইসলামের উপর যে আঘাত হানা হচ্ছে তা মোকাবিলা করার সবচেয়ে সঠিক পন্থা কোনটি?

উত্তর : ইসলামের দিকে তাক করা যে কোন অস্ত্রের মুকাবিলা তার অনুরূপ অস্ত্র দ্বারা করা মুসলিম উম্মাহ্‌র জন্য আবশ্যক। সুতরাং যারা চিন্তাধারা ও কথা দ্বারা ইসলামের সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে, শারঈ দলীলের পাশাপাশি বুদ্ধিভিত্তিক দলীল দ্বারা তাদের চিন্তাধারার অসারতা প্রমাণ করা আবশ্যক। যাতে (মানুষের সামনে) তাদের ভ্রান্তি সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়। যারা অর্থনৈতিক দিক থেকে ইসলামের সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে, তাদের মুকাবিলা করা আবশ্যক। বরং সম্ভব হলে তারা ইসলামের সাথে যেরূপ যুদ্ধ ঘোষণা করেছে তদ্রুপ (দলীল ও যুক্তি দ্বারা) তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়া এবং একথা প্রমাণ করা আবশ্যক যে, ন্যায়নীতি ও ইনছাফপূর্ণভাবে অর্থনীতির গতিকে সঠিক পথে পরিচালিত করার পন্থা একমাত্র ইসলামেই রয়েছে। আর যারা অস্ত্র দ্বারা ইসলামের সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে, তাদেরকে তদ্রুপ অস্ত্র দ্বারা প্রতিরোধ করা উচিত। এজন্য আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِيْنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَـــصِيْرُ. 'হে নবী! কাফের ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর এবং তাদের প্রতি কঠোর হও। তাদের আশ্রয়স্থল জাহান্নাম, তা কত নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল' *(তাহরীম ৯)*।

প্রশ্ন-১৩ : মতভেদ দূর করার জন্য দাঈদের সাথে কাজ করা ও সহযোগিতা করার নীতি কি বলে আপনি মনে করেন?

উত্তর : এরূপ মতভেদের ক্ষেত্রে কুরআন মাজীদের নিম্নের আয়াত দু'টিতে আল্লাহ যে দিকনির্দেশনা প্রদান করেছেন সেদিকে ফিরে যাওয়া কর্তব্য- يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا أَطِيْعُوا اللهَ وَأَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَأُوْلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُوْلِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْـــرٌ وَّأَحْـــسَنُ تَـــأْوِيْلاً. 'হে মুমিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস কর তবে তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্‌র, আনুগত্য কর রাসূলের এবং তাদের, যারা তোমাদের মধ্যে ক্ষমতার অধিকারী। কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ হলে তা উপস্থাপিত কর আল্লাহ ও রাসূলের নিকট। এটাই উত্তম ও পরিণামে প্রকৃষ্টতর' *(নিসা ৫৯)*। وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيْهِ مِنْ شَــــيْءٍ فَحُكْمُـــهُ إِلَـــى اللهِ. 'তোমরা যে বিষয়েই মতভেদ কর না কেন- তার মীমাংসা তো আল্লাহ্‌রই নিকট' *(শূরা ১০)*।

আকীদা ও আমলগত বিষয়ে যে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে তার সাথে আলোচনা করা আবশ্যক। যাতে তার জন্য হক প্রতিভাত হয় এবং সে হক পথে ফিরে আসে। ভুল-ভ্রান্তি সম্পর্কে তাকে অবগত করা এবং সাধ্যানুযায়ী তাথেকে সতর্ক করা আবশ্যক। এরপরেও (সে না মানলে) আমরা নিরাশ হব না। কেননা অনেক বড় বিদ'আতী ব্যক্তিকেও আল্লাহ (সঠিক পথে) ফিরিয়ে এনেছেন। এমনকি অবশেষে তারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। আমরা জানি যে, আবুল হাসান আশ'আরী (রহঃ) জীবনের সুদীর্ঘ চল্লিশ বছরব্যাপী মু'তাযিলা মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। অতঃপর কিছুদিনের জন্য কিছু বিষয়ে মধ্যপন্থা অবলম্বন করেন। তারপর আল্লাহ তাঁকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতভুক্ত ইমাম আহমাদ (রহঃ)-এর মাযহাবের দিকে হেদায়াত দান করেন। সারকথা, আকীদাগত বিষয়গুলো গুরুত্বপূর্ণ এবং এ ব্যাপারে নছীহত করা আবশ্যক। অনুরূপ আমলের ক্ষেত্রেও নছীহত করা কর্তব্য।

প্রশ্ন-১৪ : নিফাক ও রিয়ার মধ্যে পার্থক্য কি? এ দু'টোর কোনটি মুসলিম দাঈর জন্য বেশি ক্ষতিকর?

উত্তর : দু'টোই খারাপ। তবে নিফাক বেশি জঘন্য। কেননা নিফাক হচ্ছে- মনে অনিষ্ট লুকিয়ে রেখে বাহ্যিকভাবে ভাল প্রকাশ করা। চাই নিফাক আকীদাগত ক্ষেত্রে হোক বা আমলগত। তবে আকীদাগত নিফাক ইসলাম থেকে বের করে দেয়।

আল্লাহ্র নিকট এথেকে আশ্রয় চাচ্ছি। আর আমলগত নিফাক কখনো কখনো ইসলাম থেকে বের করে দেয়, আবার কখনো দেয় না।

আর রিয়া হচ্ছে- মানুষ কোন সৎ কাজ আল্লাহ্র জন্য সম্পাদন করে। কিন্তু সে লোকদেখানো এবং মানুষের প্রশংসা লাভের জন্য সুন্দর করে তা সম্পাদন করে। সে ভাল কাজ করতে চায়। কিন্তু মানুষের প্রশংসার প্রতি লক্ষ্য রেখে ভালভাবে আমল সম্পাদন করে। এর মাধ্যমে সুস্পষ্ট হল যে, নিফাক বেশি খারাপ। তবে রিয়া মুনাফিকদের একটি বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ তাদের সম্পর্কে বলেন, يُرَآؤُوْنَ النَّـــاسَ وَلاَ يَذْكُرُوْنَ اللهَ إِلاَّ قَلِيْلاً. 'তারা লোক দেখায় এবং আল্লাহকে তারা অল্পই স্মরণ করে' *(নিসা ১৪২)*।

প্রশ্ন-১৫ : শারঈ জ্ঞানার্জন করা, নাকি আল্লাহ্র দিকে দাওয়াত দেয়া- কোনটি উত্তম? উল্লেখ্য, যে দাওয়াত দিবে সে আহূত বিষয়ে জ্ঞান রাখে।

উত্তর : এ সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য হল, অবশ্যই দাঈকে জ্ঞান অর্জন করতে হবে। তবে এটা আমাদের নিকট সুস্পষ্ট যে, প্রত্যেক মানুষের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে এবং যে কোন একটি বিষয়ে সে পারদর্শী হতে চায়। অনেক ছাত্রকে দেখা যায়, সে আকীদা বিষয়ে পারদর্শিতা অর্জনে ও তৎসংশ্লিষ্ট বইপত্র অধ্যয়নকে প্রাধান্য দেয়। আরেকজন ফিকহকে প্রাধান্য দেয়। কেউ আবার আল্লাহ্র দিকে দাওয়াত দেয়া এবং সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করতে পছন্দ করে। মানুষের আগ্রহের এই ভিন্নতা আল্লাহ্র অপার নে'মত। যদি তারা সবাই একই বিষয়ে আগ্রহী হত, তাহলে অনেক বিষয় ভারসাম্যহীন-বিশৃংখল হয়ে পড়ত।

যে ব্যক্তি মনে করে গভীর জ্ঞান অর্জনের সামর্থ্য তার রয়েছে, আমাদের মতে তার জ্ঞানার্জন করা এবং ফলপ্রসূ না হলে দাওয়াতে বের হওয়া অনুচিত। কেননা মুসলিম দেশসমূহ আকীদা, আখলাক সহ সকল দিক থেকে আগ্রাসনের শিকার। তাই কোন মানুষের শারঈ মূলনীতি ও বুদ্ধিভিত্তিক দলীলের উপর ভিত্তিশীল গভীর জ্ঞান না থাকলে সে খেই হারিয়ে ফেলবে।

এ প্রেক্ষিতে ছাত্রদের বুদ্ধিভিত্তিক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন বলে আমি মনে করি। কিন্তু কেন? কারণ মানুষের ঈমান দুর্বল হয়ে যাওয়ার কারণে শারঈ দলীলের চেয়ে বুদ্ধিভিত্তিক দলীল দ্বারাই তারা বেশি পরিতুষ্ট হয়। এ কথার উদ্দেশ্য হল- ছাত্র ভাইদেরকে বুদ্ধিভিত্তিক ও কারণভিত্তিক জ্ঞান অর্জনে উৎসাহিত করা। আমি যা বলছি যদি তার সত্যতা যাচাই করতে চায়, তাহলে তারা যেন দার্শনিক, যুক্তিবিদ ও অন্যদের মত খণ্ডনে শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়ার বক্তব্য লক্ষ্য করে। তারা

দেখবে যে, তিনি শারঈ ও বুদ্ধিভিত্তিক উভয়ই দলীল পেশ করে বক্তব্য উপস্থাপন করছেন।

আর যদি কোন ব্যক্তির গভীর পাণ্ডিত্য অর্জনের ক্ষমতা না থাকে, তাহলে সে আল্লাহ্র পথে দাওয়াতের জন্য বের হবে। কিন্তু সে ততক্ষণ পর্যন্ত কোন বিষয়ে দাওয়াত দিবে না যতক্ষণ না অবগত হবে যে, আহূত বিষয়টি হক বা সঠিক। কখনো অনুমানভিত্তিক কোন কথা বলবে না। কতিপয় দাঈর ন্যায় সে মানুষকে কাঁদানো বা তাদেরকে দিকনির্দেশনা প্রদানের জন্য যঈফ ও জাল হাদীছ বলবে না। এটি ভুল। যঈফ ও জাল হাদীছ- যা শরী'আতের অন্তর্ভুক্ত নয়, মানুষকে দিকনির্দেশনা প্রদানের জন্য তা উপস্থাপন করা তার জন্য ঠিক নয়। হ্যাঁ, কতিপয় আলেম ফাযায়েল ও ভীতি প্রদর্শনমূলক যঈফ হাদীছ উল্লেখের ক্ষেত্রে তিনটি শর্ত উল্লেখ করেছেন। যথা-

১. হাদীছটির দুর্বলতা বেশি হওয়া চলবে না (ألا يكون الضعف شديدا)।
২. সেটির সমর্থক মূল ছহীহ কোন বর্ণনা থাকবে (وأن يكون لذلك أصـــل صحيح)।
৩. হাদীছটি উল্লেখকারী একথা বিশ্বাস করতে পারবে না যে, সেটি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে ছহীহ সূত্রে প্রমাণিত (وأن لا يعتقد القائل أن ذلك صح عن النبى صلى الله عليه وسلم)।

মোদ্দাকথা, মানুষের রুচির ভিন্নতা রয়েছে। কারো ইলমী তাহকীকের প্রতি ঝোঁক বেশি। কেউ আবার তা করতে অক্ষম। প্রত্যেকেরই পছন্দসই কর্মক্ষেত্র রয়েছে।